চতুর্থ অধ্যায়

বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের সাধারণ প্রে(ি ত ঃ চা শ্রমিকদের অনুপস্থিত উপস্থিতি

বরাক উপত্যকার ভৌগোলিক বিন্যাস —

বৈচিত্রময় আসামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ বরাক উপত্যকা। প্রান্তীয় এই উপত্যকা বহু বৈচিত্রপূর্ণ জনবিন্যাসে সুসজ্জিত। বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-সংস্কৃতির সমন্বয়ে বিবিধের মাঝে মহান মিলনকেন্দ্র এই বরাকভূমি। এই উপত্যকার ভৌগলিক অবস্থান বিচিত্র জনগোষ্ঠী গড়ে তোলার পেছনে বিশেষ উপাদানও বটে। বরাক উপত্যকার জনবিন্যাস ও জাতিগঠন প্রত্রি(য়া শ্রীহট্ট তথা বৃহত্তর বঙ্গভূমির সঙ্গে সমান্তরালভাবেই ঘটেছে। বাঙালির ইতিহাসকার নীহাররঞ্জন রায়ও একই কথাই বলেছেন। আর্য-অনার্য-দ্রাবিড়-অস্ট্রিক- মোঙ্গল প্রভৃতির টানাপোড়েনে বরাকের জনবিন্যাস সুগঠিত। [১]

বরাক উপত্যকা ছোট একটি ভূখণ্ড যার তিনটি দিককে ঘিরে রেখেছে মেঘালয়, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও মণিপুরের প্রাকৃতিক শোভা। আর অপর সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশ। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির এক উন্মুক্ত(প্রাঙ্গণ। বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত শ্রীহট্ট বা শ্রীভূমি একদা বরাক উপত্যকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে ছিল। দেশ বিভাজন ছিনিয়ে নিয়ে গেল শ্রীহট্টকে, কিন্তু ছিন্নমূল সংস্কৃতির শিকার করে রেখে গেল সুরমা তীরের ছোটখণ্ডকে যা আজকের বরাক উপত্যকার অংশ বিশেষ।

কবিগু(রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি(টি স্মরণযোগ্য —

''মমতাবিহীন কালস্রোতে

বাংলার রাষ্ট্রসীমা হতে,

নির্বাসিতা তুমি

সুন্দরী শ্রীভূমি —''

শ্রীহট্ট সম্পর্কে এই উক্তি(কাছাড় জেলা সম্পর্কেও প্রযোজ্য হতে পারে। এ দুটি জেলাই ছিল ভৌগোলিক ও ভাষাগত বিচারে অভিন্ন।[২]

স্বাধীনতার পূর্ববর্তীকাল পর্যন্ত বরাক উপত্যকার পরিচিতি ছিল সুরমা উপত্যকা নামে। ১৮৭৪ সালে গভর্ণর জেনারেল নর্থ ব্রুকের সময়ে Sheduled District Act XIV অনুসারে ব্রিটিশ রাজশক্তি(শাসনকার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও কিছু পার্বত্য অঞ্চল নিয়ে স্বতন্ত্র আসাম প্রদেশ গঠন করল। রাজস্ব বৃদ্ধির প্রয়োজনে বঙ্গভূমির অঙ্গ শ্রীহট্ট জেলাকে বঙ্গদেশ থেকে সরিয়ে এনে আসামের সঙ্গে যুক্ত(করে দেয়।[৩]

তখন শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে 'সুরমাভ্যালী ডিভিশন নাম দিয়ে একটি নতুন বিভাগ তৈরি করা হয়। সেই অনুসারে ১৮৭৪-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে একসঙ্গে সুরমা উপত্যকা বলা হত। ১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক আবর্তে পরে শ্রীহট্টের কেবল সাড়ে তিনটি থানা ছাড়া সমগ্রটাই পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়ে গেল। সে থানাগুলোর সমন্বিত গঠন আজকের করিমগঞ্জ জেলা। এই করিমগঞ্জ জেলা, হাইলাকান্দি ও শিলচর অর্থাৎ কাছাড় জেলার ভূভাগ আজ বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত। বরাক শব্দটি বরবত্র(শব্দজাত। বরবত্র(নদীর উপত্যকাই বরাক উপত্যকা নামে পরিচিত।[৪]

বরাক উপত্যকার নামকরণ খুব বেশি পুরনো নয়। সুহাস চট্টোপাধ্যায় বলেছেন —

> "The term Barak valley is of very recent origine, Indeed, Barak valley is the post partitioned undivided Cachar district in Assam"

— বাস্তবিক ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত এই অঞ্চলের সাধারণ পরিচিতি ছিল কাছাড় জেলা হিসেবে। ১৯৮৩ সালে করিমগঞ্জ মহকুমা জেলাস্তরে উন্নীত হবার পর কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলা দুটি এই ভূ-খণ্ডের প্রধান নদী বরাকের নামানুসারে 'বরাক উপত্যকা' নামক সাধারণ ভৌগলিক পরিচয় লাভ করে। আর ১৯৮৯ সালে হাইলাকান্দি মহকুমাকে জেলাস্তরে উন্নীত করার ফলে বরাক উপত্যকা নামক সাধারণ ভৌগোলিক পরিচয়টি আরও দৃঢ় হয়।[৫]

বরাক উপত্যকার ছোটগল্পের প্রে(াপট —

বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে লিটল ম্যাগাজিন এক গু(ত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম। বহুকাল থেকেই এ অঞ্চলের কবি সাহিত্যিকরা তাকে আশ্রয় করেই সাহিত্য চর্চা করে চলেছেন। বরাক উপত্যকার সাহিত্যে আধুনিকতার জোয়ার নিয়ে এসেছিল স্বপ্নিল, অতন্দ্রেরা কাব্যের জগতে আর গদ্যের (ে ত্রে সম্ভার, অনিশ, শতত্র(তু, সাহিত্য, প্রতিস্রোত, সর্পিল, উন্মোচন, অঙ্গীকার প্রভৃতি।

বরাক উপত্যকার সাহিত্যের ইতিহাসে পঞ্চাশের দশকের অধিকাংশ ছোট পত্রিকাই ছিল কবিতা পত্রিকা। ১৯৫৭ সালে সম্পাদকদ্বয় অজিতকুমার নাগ এবং অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত পূজোয় সম্ভার পত্রিকার প্রকাশ ঘটিয়ে তাতে গল্প, প্রবন্ধ এবং চলচ্চিত্রকেও স্থান দিলেন। মোটমুটিভাবে তখন থেকেই বাংলা ছোটগল্প রচনার ইতিহাস শু(হয়েছিল।[৬]

বরাক উপত্যকার বাংলা গল্পচর্চার পথ পরিত্র(মা বেশিদিনের নয়। বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যে যখন ছোটগল্পের (ে ত্রে অনেকদূর অগ্রসর, সে সময়ে বরাকে বাংলা গল্পচর্চার আরম্ভ। একমাত্র লিটল ম্যাগাজিনই ছিল তখন এ অঞ্চলের সাহিত্য চর্চার গু(ত্বপূর্ণ প্রকাশ মাধ্যম। বর্তমানে সে অবস্থারও তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। ১৯৫৭ সালে সম্ভার পত্রিকার হাত ধরেই ছোটগল্পের যাত্রা শু(হয়েছিল। পরবর্তীতে অনিশ, শতত্র(তুর মত পত্রিকাকে আশ্রয় করেই সমৃদ্ধ হয় বরাকের গল্পভূবন। অনিশকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয় আধুনিকতার বীজ এবং তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে শতত্র(তুতে। পরবর্তীকালে লিটল ম্যাগাজিনকে প্রকাশ মাধ্যম করে গল্পচর্চা চলতে থাকে এবং বর্তমানে সে ধারা গৌরবের সঙ্গে অব্যাহত।[৭]

ভাষিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রে(ি ত —

বাংলা সাহিত্যের মূল ভূখণ্ড থেকে অনেক দূরের প্রান্তিক এ অঞ্চলের জীবন পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি জীবন থেকে আলাদা। এ অঞ্চলের বাংলা গল্পে ব্যক্তি(র আশা আকাঙ(ায় থাকে আলাদা জীবনবৈশিষ্ট্যের ছাপ। ভারতবর্ষে যে সমস্ত মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে ভিন্ন ভাষা গোষ্ঠী মানুষের সংস্কৃতির সংঘাত সমন্বয়। বরাক উপত্যকায়ও এই সংঘাত ও সমন্বয় ঘটেছে কিছুটা মন্থর গতিতে। তবে চা বাগিচা পত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এতদঞ্চলে সংস্কৃতির দ্রুত রূপান্তর ঘটেছে। বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ভিন্ন জাতি ও উপজাতির বাস চতুর্দিক পাহাড় ঘেরা বরাক উপত্যকায়। তাই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের আচার আচরণ, সংস্কৃতি, প্রেম-ভালবাসা, পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে এক নূতন ধরণের ছবি আঁকেন এ অঞ্চলের লেখকরা। যা বাংলা সাহিত্যে একেবারেই নূতন। শুধু নান্দনিক প্রকাশ নয় এ অঞ্চলের লেখকরা সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখেই সমাজ ও সময় সচেতন হয়ে লেখায় নিজস্ব প্রে(ি ত গড়ে তুলেন। প্রথমদিককার লেখকরা নিজের অঞ্চলের ছোটবড় অনেক ঘটনা ও সমস্যাকে এড়িয়ে গেলেও আশির দশক থেকে লেখকরা নিজস্ব অঞ্চলের সমস্যা ও আঞ্চলিক ভাষা প্রয়োগের মাধ্যমে সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন।[৮] বহুভাষিক, বহুধর্মের, বহু সমাজের একত্র সমন্বয়ে বরাক উপত্যকার জনজীবনে, সংস্কৃতিতেও বৈচিত্রময়তার প্রকাশ দেখা যায়।

দেশ বিভাজনের মর্মান্তিক প্রতিত্রি(য়া এ অঞ্চলের মানুষ বুঝেছিল জীবন দিয়ে। ছিন্নমূল মানবসত্তার প্রবাহ, ভেঙে পড়া মানবিক মূল্যবোধ, নৈরাশ্য, সমাজজীবনে বিচ্ছিন্নতার অসহায়ত্ব নিয়ে বরাকবাসীর জীবন। বাংলা ভাষার মর্যাদা র(ায় জীবন বলি দিতে হয় বরাকের সন্তানদের। মানসিক স্থিতিলাভের আগেই ভূমিকম্পের মত অতর্কিতভাবে আমাদের তথা বরাকের বাঙালিদের সমূলে নাড়িয়ে দেয় স্বদেশী-বিদেশী বিভেদ বিভাজন। এরকম সময়ে সাহিত্যে সত্য বলা ছাড়া উপায় থাকে না। দেশভাগ, বাস্তুত্যাগ, বাস্তুহারা-সমস্যা, বেদনা মানসিক ও সামাজিক (তি রাজনৈতিক ও ভৌগলিক প্রতিবন্ধকতা, বিদেশী বিতাড়ন, উগ্রপন্থী সমস্যা, ভাষা সঙ্কট, ১৯ শের চেতনা, নানা পর্যায়ে বিশাল এই সমস্যাদীর্ণ অভিজ্ঞতা এ অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই নিজস্বতাকে ধারণ করেই গড়ে উঠেছে বরাকের গল্পবি(্ব। গল্পের বিষয় তাই

প্রাণবন্ত এবং বৈচিত্র্যে ভরা। উদীয়মান মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, সামাজিক ও রাজনৈতিক অব(য় গ্রামজীবনের সংস্কার ও কুসংস্কার, প্রাত্যহিক জীবনের টানা পোড়েন, চা বাগিচার (ুধার্ত জীবন, অন্তেবাসীদের বেঁচে থাকার লড়াই ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে সময় ও সমাজের সত্যরূপ ফুটে উঠে বরাকের গল্প বি(ে। আন্তর্জাতিক আবহকে গ্রহণ করার সচেতন প্রয়াস যেমন আছে তেমনি আবার লোকায়ত উৎস থেকে বিচ্ছিন্নতার বেদনাও ধরা পড়েছে বিভিন্ন গল্পে। [৯]

আমার আলোচনার বিষয় যেহেতু বরাক উপত্যকার ছোটগল্পে চা শ্রমিকদের স্থান। তাই মূলত চা বাগান সম্পর্কিত লেখা ছোটগল্পের প্রতিই আমি দৃষ্টিপাত করেছি। চা বাগানের শ্রমিকদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যা, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক সংকট, নানা সংস্কার-কুসংস্কার নিয়ে অনেকেই গল্প লিখেছেন। বিভিন্ন বাগান ঘুরে এবং বিভিন্ন জনের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি লিখিত তথ্য তাদের কাছে তেমন ভাবে নেই।

বাগানের জীবন নিয়ে যে সীমিত সংখ্যক সাহিত্য রচনা হয়েছে তার প্রকাশ এবং প্রচারের (ে ত্রও একটা গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। তার বহুবিধ কারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে বাগান অঞ্চলে শি(ার অপ্রতুলতা এবং চা বাগানের জীবনযাত্রা নিয়ে বাইরের লোকের অনাগ্রহ। চা বাগানের সঙ্গে বাইরের লোকজনের ব্যবসায়িক আদান-প্রদানের প্রাধান্য বুঝতে অসুবিধার কারণ নেই। তার প্রকৃতিতম মনোরম পরিবেশে ২/১ দিন পিকনিক হৈ-হুল্লোড় ব্যস। পরিচিত সাদা চোখে দেখা জীবনের আড়ালে শ্রমিকদের আশা-আকাঙ(া, স্বপ্ন ভালবাসা, হতাশার দ্বন্দ্বে বিধূর যে জীবনের ছায়া-প্রচ্ছায়া আছে, ও পথ মাড়াতে তথাকথিত প্রাগ্রসর সংস্কৃতির মান সমাজের অনাগ্রহ বাগান ভিত্তিক সাহিত্যের প্রচার ও প্রসারে এক দুর্লঙঘ্য বাধা। আর তাই বোধ হয় চা বাগানের সাহিত্য উপত্যকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক সাময়িকীর পাতা স্কুল-কলেজের মুখপত্র, গ্রাম-শহরে প্রকাশিত স্মরণিকা আর আঙুলে গোনা যায় এমন কিছু ব্যতিত্র(মী লেখক-শিল্পীর নিজের আড্ডার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। [১০]

বরাক উপত্যকা যেহেতু সবদিক থেকে চা বাগানে ঘেরা তাই অন্যান্য দিকের মত চা শ্রমিকদের জীবনযাপনকে কেন্দ্র করেও অনেকে তার গল্পবি(েকে সমৃদ্ধ

করেছেন। বরাক উপত্যকার অনেকেই চা শ্রমিকদের জীবনযাত্রা, নানা ঘাত-প্রতিঘাত, সংস্কার-কুসংস্কার নিয়ে গল্প লিখেছেন। চা বাগান সম্পর্কিত গল্প বা লেখালেখির কথা বলতেই সর্বাগ্রে লেখিকা ঝুমুর পাণ্ডের নাম উচ্চারিত হয়। তিনি মূলতঃ বাগানের শ্রমজীবী সম্প্রদায় ও চা বাগানের মায়াময় প্রকৃতি সঞ্জাত পরিমণ্ডলে শাসন ও শোষণ কবলিত সামঞ্জস্যহীন সমাজজীবন নিয়ে গল্প লিখেছেন।

ঝুমুর পাণ্ডে ছাড়া বরাক উপত্যকার আরো অনেকে তাদের গল্পে চা শ্রমিকদের দুঃখ দৈন্য সহ জীবনের নানা চিত্র সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এদের মধ্যে হলেন কাজল দেমতা, দীপ্তি দেব প্রমুখ। মূলতঃ সমাজে বিশেষ করে বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের জীবনের কোন মূল স্রোতে দেখা যায় না। অথচ বরাক উপত্যকার জনবিন্যাসে, অর্থনীতিতে তাদের একটা বড় অবদান আছে। বরাক উপত্যকার চা দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিত্রি(হচ্ছে। তার লভ্যাংশ থেকেও শ্রমিকরা বঞ্চিত। গল্পকারেরা তাদের নিয়ে, তাদের জীবন যাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে গল্প লিখে সাহিত্যে তাদের একটা স্থান করে দিয়েছেন।

বরাকভিত্তিক চা বাগানকেন্দ্রিক জীবন লেখকের গল্পের পটভূমি ও চরিত্রের বিষয় হলেও এদের আছে অন্তর্গত ত্র(মবিন্যাস, ত্র(ম উত্তরণ। জীবনের চলমানতার সাথে সাথে অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধও ত্র(মশ ঃ গাঢ় হয়ে উঠে। গল্পবিন্যাসের ত্র(ম সে চিত্রের প্রতিফলক। এযাবৎ প্রকাশিত গল্পকারের গল্প বি(-ষণে আমরা তাই তার প্রাথমিক সম্ভাবনা এবং ত্র(মপরিণতির স্তর পর্যায়কে নিরিখে রেখে প্রথম পর্যায় এবং পরিণত পর্যায় এই দুভাগে ভাগ করেছি। আলোচনার সৌকর্যকে মনে রেখেই আমরা এই বিভাজন রেখা করেছি।

বিচিত্র জনবিন্যাস, ভাষাগোষ্ঠী, ভৌগোলিক বৈচিত্র নিয়ে বরাকের যে স্বতন্ত্র অবস্থিতি তা বরাক কেন্দ্রিক গল্পের সমূহ উপজীব্য হিসেবে কাজ করেছে। এখানে মা, মাটি, মানুষের ভাষাকৃষ্টির সার্বিক রূপায়ণে বরাকের গল্পভুবন সমৃদ্ধ। ব্রিটিশ ভারতে উপনিবেশের সাথে সাথে চা শিল্প বিজড়িত। বিশেষত বরাক উপত্যকা বা আসামের বিভিন্ন স্থানে যে চা বাগানগুলি গড়ে উঠেছে তার শাসক প্রভু, ব্রিটিশ বা পরবর্তীকালে দেশীয় উচ্চবর্গীয় হলেও তার আধার ভূমি আসলে চা শিল্পের মূল শ্রমজীবী সম্প্রদায়

যাকে আমরা চিহ্নিত করেছি চা জনগোষ্ঠী হিসেবে। সেই চা কর শ্রমজীবীরা মূলত শোষিত সমাজের অঙ্গীভূত। তাদের শ্রেণিচরিত্র সকল শ্রমজীবী সমাজের একাংশ হলেও নিজস্ব গোষ্ঠী জীবনের বৈশিষ্ট্য ও অনন্য সাধারণ বিশেষত বরাকের চা শিল্পের প্রেক্ষিত।

বরাক উপত্যকার চা জনজীবন আসলে বর্হিরাজ্য এবং বরাকের নিজস্ব শ্রমজীবী জনতার এক দলবদ্ধ একক। এই জীবনেরও আছে সমান্তরাল সংস্কৃতির সঙ্গে দূরত্ব ও সমন্বয়। উভয়ের যৌগপদ্যে তার সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। সেখানেও শোষিত, শোষক নারীপুরুষ প্রান্তিকায়িত আলোকিত বৈপরিত্যের দ্বন্দ্ব আছে। যে দ্বন্দ্ব সমকক্ষে কখনো প্রকট, আবার কখনো অপ্রকট প্রতিবাদ আপাত অনুপস্থিতির চোরাগলিতে বিচিত্ররূপে নিজের অস্তিত্বকে জাহির করে। সেখানে আছে সংস্কৃতি, ভাষা জীবন জীবিকার নানা পরত। চা শিল্পের ইতিহাস অবলম্বনে সে জীবনের যে প্রেক্ষিতের কথা জানা যায় গল্পকারদের গল্পভুবনে তা বিচিত্র কথা কাহিনির রূপ ধরে আমাদের মনোলোকে স্থান করে নেয়। গল্পের বিচিত্র ভুবনে উঠে আসে এমন অনাম্নী অঙ্গনা যারা আলোকিত হয়ে উঠে অনুপস্থিতির মধ্যেই। আবার অনেক প্রান্তিকায়িত শোষিত জন তাদের প্রতিবাদ যে ভাষা ও ভঙ্গীতে প্রকাশ করে তা অধিগম্য হয়ে উঠে লেখকের বাচন কৌশল এবং পাঠকের অন্তঃদৃষ্টির তথা পুনঃপাঠের দ্বিরালাপিক প্রয়াসে। এই অনুপস্থিত উপস্থিতিই আমার মূল অন্বেষণ।

বরাক উপত্যকার চা জনজাতিদের নিয়ে লেখালেখির ব্যাপারে সবার আগে নাম উঠে আসে ঝুমুর পাণ্ডের। চা জনজাতিদের সঙ্গে তার জীবন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাল্যকাল থেকেই তিনি তাদের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাদের জীবনযাত্রা, চালচলন, পালাপার্বণের সঙ্গে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তার গল্পে চা জনজাতিদের বিভিন্ন দিক নানা ভাবে, নানারূপে ধরা পড়েছে। ঝুমুর পাণ্ডের গল্প নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে তার জীবনযাত্রা সম্পর্কে একটু জানা প্রয়োজন।

ঝুমুরপাণ্ডের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি —

জন্ম অসমের হাইলাকান্দি জেলার কাটলিছড়া চা বাগানে এক প্রগতিশীল

সংস্কৃতিমনস্ক বামপন্থী পরিবারে। বাবা সমাজকর্মী বিনয় কুমার পাণ্ডে এবং মাতা প্রয়াতা সমাজকর্মী লীলা পাণ্ডে। ছোটবেলা থেকেই তার লেখালেখির শু(এবং তখন থেকেই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে চলেছে তার লেখা। লেখালেখি শুধু তার শখ নয়। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই তার লেখালেখি। মূলতঃ চা বাগান এবং খেটে খাওয়া মানুষদের নিয়েই গল্প লেখেন। তামিল, তেলেগু, ওড়িয়া, ইংরেজি, হিন্দি, মাদ্রাজি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তার গল্প অনুবাদ হয়েছে। সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন বেশ কটি পুরস্কার এবং সম্মান। এই এক অন্যধারার লেখিকার লেখা বাংলা সাহিত্য এবং অন্যান্য সাহিত্যেরও বিভিন্ন সংকলনে সংকলিত এবং বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থেও আলোচিত হয়েছে। তাঁর গল্প 'মধুরাবতী সাঁতার কাটে' নিয়ে দূরদর্শন টেলিফিল্ম তৈরি করেছে যা বহুল প্রশংসিত। নারী আন্দোলন এবং সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত(লেখিকা সেতারও বাজান।

প্রকাশিত গ্রন্থ —

১। গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া — গল্পগ্রন্থ ১৯৯৭

২। স্বপ্নগন্ধার খোঁজে — গল্পগ্রন্থ ১৯৯৯

৩। সুখ গাছের গল্প — গল্পগ্রন্থ ২০০৫

৪। আলেকজাণ্ডারপুরের কথকতা — উপন্যাস ২০০৭

৫। কিছু বলার ছিল — কাব্যগ্রন্থ ২০০৪

৬। গাঙগাথা — উপন্যাস ২০১১

৭। জলখাবেন বনদুর্গা — গল্প গ্রন্থ ২০১৩

৮। পিস্তি ও সেই স্বপ্নপাখি সুরেলা, ছোটদের গল্পগ্রন্থ (যন্ত্রস্থ)

পুরস্কার —

১। জোনবির সাহিত্য চরা আয়োজিত (অসম) রাজ্যভিত্তিক গল্প প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কার (১৯৯৭)।

২। চন্দ্রাবতী স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার শিলচর (অসম) ২০০২।

৩। একসাথে রজতজয়ন্তী পুরস্কার, কলকাতা, (পশ্চিমবঙ্গ) ২০০৬।

৪। আশাপূর্ণা দেবী স্মারক সম্মান, কলকাতা, (পশ্চিমবঙ্গ) ২০০৯।

৫। বর্হিবঙ্গ পুরস্কার (দিল্লি) ২০০৯।

৬। ভাষা শহিদ স্মারক পুরস্কার, শিলচর (অসম) ২০১২।

সংবর্ধনা —

১। বরাক উপত্যকা চা যুব কল্যাণ সমিতি — ২০১১।

২। প্রতিশ্রুত মহিলা কল্যাণ সমিতি হাইলাকান্দি — ২০০৭।

৩। দিবাকর রজতজয়ন্তী সংবর্ধনা — ২০০৬।

৪। সতীন্দ্র মোহন স্মৃতি সংবর্ধনা — ২০০৭।

৫। সংলাপ সংবর্ধনা, গুয়াহাটি — ২০০৮।

৬। প্রাংশু সংবর্ধনা — দিল্লি ২০০৬।

ঝুমুর পাণ্ডের লেখালেখির সম্পর্কে জানার আগ্রহ নিয়ে ওনার সাথে দেখা করলে

তিনি তার লেখালেখি সম্পর্কে যে বক্ত(ব্য তুলে ধরেন, আমি সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

আমার লেখালেখির শু(র কথা বলতে হলে বলতে হয় আমি একেবারে প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছি। আর চারপাশে ছিল হতদরিদ্র মানুষেরা। যাদের ভালবাসায় আমি সিক্ত(। আপ্লুত। তাদের দুঃখ ছিল, কষ্ট ছিল, তবে দুঃখ কষ্টের মধ্যে ছিল সুখেরও ঝিলিক। ওরা আমার ভীষণ আপন ছিল। ওদের কাছে আমি আমৃত্যু ঋণী। দুঃখ-দারিদ্রের মধ্যে ওদের কতরকম পালাপরব। মাদলের দ্রিমদ্রিম শব্দে রাতগুলো কেমন ছন্দময় হয়ে উঠত।

চা বাগানের মানুষের কষ্টে আমার কান্না পেয়ে যেত। ওদের জীবন থেকেই আমার লেখার প্রেরণা পাই। এছাড়া আমার ঠার্কুদা মৃত্যুঞ্জয় পাণ্ডের একটা ছোটখাটো লাইব্রেরি ছিল। ওখানে পুরনো একগাদা ভারতবর্ষ পত্রিকা, একগাদা প্রবাসী, ভারতী এছাড়া আলালের ঘরের দুলাল, নবীনচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, পথের পাঁচালী, মধুসূদন, প্রেমচান্দ, বঙ্গিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বোদলেয়ার প্রভৃতি অনেকরকম বই ছিল। ঝিমঝিম দুপুরে ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক শুনতে শুনতে আমি ওই বই পত্তরের মাঝে ডুবে থাকতাম। একদিন ওইরকম চাঁদের আলো, পাখির ডাক শুনতে শুনতে প্রথম গল্প না একটা কবিতা লিখে ফেললাম। তখন আমি দশ। ওই দশেই আবার একটা গল্পও লিখলাম। 'ভাঙিলে বাঁধ মানে না', ওইতো আমার লেখালেখির শু(। গল্পটা প্রথম মা দেখেছিল। পড়ে খুব খুশী হল মা। পড়তে আমার মা, ভীষণ ভালবাসত। পড়ত আমার বাবা, কাকু, ঠার্কুদা এবং পিসিও। তারপর একটার পর একটা গল্প লিখে চললাম। ডালিম, গতি, প্রান্তজ্যোতি, সোনার কাছাড় বিভিন্ন পত্রিকায় তখন থেকেই প্রকাশিত হতে লাগল। ব্রাত্যজনদের নিয়েই আমার লেখালেখি, ভাবনা, চিন্তা, সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই লিখি। আর প্রেরণা বলতে প্রকৃতিই আমার প্রেরণা। আর বাকিটা নিজের ভিতরের তাগিদেই লিখি। তবে গল্পের ফর্ম নিয়ে আমি তেমন মাথা ঘামাই না। আমার মনে হয় ওটা একেকজনের কাছে একেকরকম। আর মনে করি ওটা গল্প ঠিক করবে। গল্পের পট নিয়েও আমি কোনও পরী(া নিরী(া করি না। তবে ভাঙতে চাই নিজেকে, একটা ভাল কিছু, নতুন কিছু করতে চাই। আমি কল্পনায় ভর করে কিছু লিখি না। চা বাগানের মানুষজনদের আমি কাছ থেকে

দেখেছি, দেখেছি ওদের কষ্ট, ওদের দারিদ্রতা।

গল্পে প্রতীতী ব্যবহার বা ইঙ্গিতধর্মী গল্প লিখতে চেষ্টা করি। আমার ভাল লাগে। আমি কল্পনার আশ্রয় করে শুধু লিখি না বলেছি তবুও গল্পে কল্পনার ব্যবহার তো কিছুটা আছেই। পুরো এক বাস্তব জগতকে তুলে ধরলেও কখনও কখনও কিছু কল্পনার আশ্রয়তো নিতেই হয়। গল্পে আঞ্চলিকতার প্রভাব অনেকে গল্পের ব্যপ্তিকে আঘাত করে মনে করেন। আমি মনে করি গল্পে আঞ্চলিকতার প্রভাব গল্পকে সমৃদ্ধ করে। গল্পের নির্মাণও একেকজনের কাছে একেকরকম। আমিও ঠিক কিভাবে করি বলতে পারব না। ওটা হয়ে যায়। আগে থেকে ভেবে কিছু করি না। কখনও আবার কোনও ঘটনা মনে দাগ রেখে যায় যেটা মনের ভেতরই নির্মাণ হতে থাকে। হঠাৎ একসময় আচমকা গল্প হয়ে বের হয়। আমার গল্পের নির্মাণ এরকমই। আর সামাজিক দায়বদ্ধতা তো আছেই। আমি লিখি চা বাগান এবং খেটে খাওয়া মানুষদের জন্যই। বা তামাম শোষিত নিপীড়িত মানুষদের জন্যই লেখার চেষ্টা করি। লিখতে চেষ্টা করি অব(য়ের বি(দ্ধে, লিখি স্রোতের বিপ(ে ও। অনেকের উৎসাহ ভালবাসা, সহযোগিতা আমাকে প্রতিনিয়ত উজ্জীবিত করে।

এ তো গেল ঝুমুর পাণ্ডের জীবনের লেখালেখির উৎস বা সূত্রপাতের কথা। এছাড়াও আমি ঝুমুরদিকে (আমি এখন ঝুমুরদি বলেই ডাকি) চা বাগানের শ্রমিকদের এবং তার লেখালেখির সম্পর্কে কতগুলি প্র(করেছিলাম। প্র(গুলির উত্তর তিনি এভাবে দিয়েছেন।

প্র(— লেখার প্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছ?

উত্তর — প্রকৃতিই আমার প্রেরণা। হয়তো আমার আশ্রয়ও।

প্র(— লেখার ইচ্ছে কেন এবং কোথা থেকে হয়েছে?

উত্তর — আমাদের বাড়িতেই বই পড়ার খুব অভ্যেস ছিল। আমার মা, বাবা, পিসি, কাকু, দাদু এমনকি আমার ঠাকুরমাকে দেখেছি, সবসময় বই পড়তেন। এছাড়া আমার ঠার্কুরদার একটা ছোটখাটো বইয়ের সংগ্রহশালা ছিল। সেখানে অনেক

লেখকদের বই ছিল। বিভিন্ন ধরনের পত্রপত্রিকাও ছিল। আমি ওই বই পত্রের মধ্যে ডুব দিতাম মাঝে মাঝেই। ওইসব বইপত্রের মাঝে বসেই একদিন আমার লেখার খুব ইচ্ছে হল। একটা গল্পও লিখে ফেললাম। গল্পটার নাম 'ভাঙিলে বাঁধ মানে না'। এছাড়া চা বাগানের লোকগুলোকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। আমার বাবার কাছে ওরা নানা সমস্যা নিয়ে আসত। আমিও খুব মন দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওদের সমস্যাগুলো বোঝার চেষ্টা করতাম। একসময় আমি কিছুটা ওদের সমস্যা সমাধানে জড়িয়ে পড়েছিলাম। দেখেছিলাম লোকগুলো এত খাঁটি কিন্তু চরম শোষণের শিকার। এখনও তাই লিখতে বসলে চা বাগানই আমার প্রে(াপট হয়ে যায়।

প্র(ো — দীর্ঘদিন থেকে বাগানে বসবাস করার ফলে ওদের সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক। ওদের মধ্যে কি কোন পরিবর্তন এসেছে?

উত্তর — পরিবর্তন বলতে ওরা তো ভুলেই গেছে কোথায় ছিল দেশ। আর কোথায় ছিল শিকড়। তবে সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রেখেছে নানা পালা পরবের মাধ্যমে। এই যা। তবে ওরা নিজেকে বাগানিয়া বলতেই এখন গর্ববোধ করে। তারা চা শিল্পের সঙ্গে জড়িত এনিয়ে ওরা গর্ববোধ করে। ওরা বাগানকে ভীষণ ভালবাসে।

প্র(ো — দেশীয় মালিকদের সংস্পর্শে কাজ করে ওদের উপলব্ধিটা কিরকম?

উত্তর — আগের বুড়োবুড়ি মানে যারা ইংরেজ আমলে ছিল ওদের সংখ্যা এখনতো খুবই কম। তবুও বয়স্করা যারা আছেন ওদের মতে ইংরেজ আমলই ভাল ছিল। আর শোষক তো শোষকই। তাই ওদের অবস্থার তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি।

প্র(ো — চা জনজাতিদের জীবন নিয়ে রচিত সাহিত্যে যে সার্থকতা, যে পরিচিতি, তাতে তোমার মতামত কি?

উত্তর — জানি না কি বা কতটুকু সার্থকতা। কিন্তু আমি তো দায়বদ্ধতা ভেবেই লিখি। চা বাগানের দুঃখ-কষ্ট, (ুধা, দারিদ্র, অশি(া সরলতা এসব সভ্য সমাজের কাছে লেখার মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চাই। এজন্য আমার এই লেখালেখি।

প্র(ো — ওদের জীবনের সংস্পর্শে এসে তোমার অনুভূতি কিরকম?

উত্তর — ওদের জীবনের সংস্পর্শে এসে আমি এতটুকু বলতে পারি, ওদের ভালবাসায় আমি সিত্ত(, আপ্লুত। ওদের সুখ-দুঃখ, আশা-আশাঙ(া, সর্বোপরি ওদের ওপর শোষণ আমি গল্পগুলোতে তুলে ধরতে চেয়েছি। আর চরিত্রগুলোও আমার খুব আপন দুচোখ দিয়ে চেয়ে দেখা, সেই চরিত্রগুলোই তাই আমার গল্পের চরিত্র হয়ে উঠেছে।

প্র(ো — বর্তমানে বরাক উপত্যকার চা বাগানের অবস্থান সম্পর্কে তোমার কি অভিমত?

উত্তর — বর্তমানে বরাকের চা শিল্পের অবস্থা ভালই বলতে হবে। ভবিষ্যতেও আরো উন্নত হবে। কিন্তু শ্রমিকরা যে অন্ধকারে ছিল হয়তো সেই অন্ধকারেই থেকে যাবে।[১১]

গল্পকার ঝুমুর পাণ্ডের প্রথম পর্যায়ের লেখা গল্প সংকলন *'গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া'* মোট চৌদ্দটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলি আলোচনা করে তার মধ্যে অনুপস্থিত উপস্থিতিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। তাঁর প্রতিটি গল্পের আঙ্গিকে ধরা পড়েছে 'চা' বাগানের শ্রমিক ও গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিকায়িত মানুষের জীবন — তাদের আশা আকাঙ(া, প্রেম-ভালবাসা, উৎসব-আনন্দ, নিরাশা- বেদনা, অশি(া-কুসংস্কার, সত্তা-অপরতার দ্বন্দ্ব বিরোধ , প্রতাপের অবরোধ, সত্তার আর্তনাদ, অত্যাচারের নাগপাশ, প্রতিবাদ প্রতিহিংসা ইত্যাদি। Title story বা যে গল্পের নামে গল্প সংকলনের নামকরণ হয়েছে, তার আবহ তার ছবি বরাক উপত্যকার যে কোনও চা বাগান ও তার চারপাশের বস্তির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিচ্ছবি।[১২]

আলোচ্য গল্পে দুলিয়ার দৃষ্টি দিয়ে সোঁদা মাটির গন্ধ ছেড়ে আসা গেরাম থানের যে দৃশ্যপট ভেসে উঠে তাতে তাদের দৃষ্টিতে যে জমি 'ই হামাদের (ে ত, ই-হামাদের মা-বাপ।' এই বোধ সম্পৃত্ত(জীবন ছবির উল্টো পীঠে শোষণের যন্ত্রণার যে রূপ ভেসে উঠে তাতে প্রহসনে পর্যবসিত বিচার ব্যবস্থা এবং তার পরিপোষক ধনতন্ত্রের

প্রতিভূ হিসেবে বিধ্বের বাবুরা ধরা দেন। অসম এই লড়াইয়ে দুলিয়ার স্বামী মানুষটা, শম্ভুবাবুর মাধ্যমে নিষ্ফল প্রতিবাদের চিত্র ফুটে উঠে তার ধারাবাহিকতা আসলে চলে আসছে দুলিয়ার বাপের আমল থেকে। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে যাওয়ার মধ্য দিয়ে আসলে ব্যর্থ প্রতিবাদে জীবনের স্বর্ণসময় হারিয়ে চলা একগুচ্ছ মানুষের তথাকথিত অনুপস্থিতির দৃষ্টিপথে আকর্ষিত হয়ে পাঠকের চেতনাকে নাড়া দেয়। ধরিত্রীর বুকে, সোঁদা মাটির গন্ধ মেখে বড় হয়ে উঠা গেরাম থানের মানুষেরা মাটিকে আকড়ে ধরতে চাইলেও নির্দোষত্বের প্রমাণহীনতায় জেলে পচে মরা দুলিয়ার স্বামীর মতোই মাটির স্বপ্ন মাটির মানুষের কাছে চির অধরা থেকে যায়। সেই অনুপস্থিতিকে রচনায় মূর্ত করে তুলেন গল্পকার বয়ান বিন্যাস এবং ঘটনা পরম্পরা ও প্রে(ত রচনার কৃ-কৌশলে। পিতা শম্বুবাবুর খুনী, একান্ত আপন মানুষটি এই সবকিছুকে ছাপিয়ে তীব্র হয়ে উঠে পরম ভালবাসার সোঁদা গন্ধ মাটি এভাবেই ভূমির অনুপস্থিতি পাঠকচিত্তে তীব্র উপস্থিতির ব্যঞ্জনা জাগায়।

অন্যদিকে দেখা যায় গল্পটিতে প্রতিবাদ যেন ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে। দুলিয়ার বাবা প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের প্রাণ হারায়। সে প্রতিবাদকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এক ভাল মানুষ শম্বুবাবুর আগমন ঘটে। নিরপরাধ শম্ভুবাবুও শাসকগোষ্ঠীর শিকার হয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। দুলিয়ার স্বামী সেই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে গিয়ে বিনা অপরাধে জেলে যায়। এই তিনটি মানুষের উপস্থিতি গল্পে নগন্য প্রায়। কিন্তু গল্পটিতে তাদের উপস্থিতি পাঠকের চোখ এড়ায় না।

''বিনতি বুড়ি, গাছ গাছালি শনখাড়ি পাহাড় এবং ''..... এই গল্পটির মাধ্যমে ভাঙাগড়ার এক চিত্র পাঠকের সামনে ভেসে উঠে। ঝুমুর নাচ, করমের জাগরণ, চা পাতা গাছের গন্ধ, করমপূজার, ভালোবাসার গন্ধ এসব ওলোট পালট করে দেয় বিষাণপুরের নতুন রেললাইন। তার প্রতিটি গল্পেই গ্রাম জীবনের অনুপস্থিত উপস্থিতি ল(্য করা যায়। বিনতি বুড়ি চরিত্রটির মাধ্যমে সর্বহারা এক নারীর সবকিছু হারিয়ে যাওয়ার মনোবেদনার চিত্র ফুটে উঠে। সে যেন আমাদেরই আশপাশের এমন একজন মানুষ যার জীবন একদিন ছিল পরিপূর্ণ। কিন্তু আধুনিকতার নামে চলে প্রহসন। রেল লাইন বানাতে গিয়ে বুড়ির সব শেষ হয়ে যায়। রেল লাইনটি একদিন বুড়ির পুকুর, গোয়ালঘরের বুক চিরে সবকিছু ওলট পালট করে বেড়িয়ে গেলো। একদিকে গড়তে

গিয়ে অন্যদিকে যে মানুষের সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়। এমনই সর্বহারা এক নিরাশ্রয় মহিলা বিনতি বুড়ির মতো আরো অনেক অসহায়ত্বের উপস্থিতি পাঠকের চিত্তকে নাড়া দিতে স(ম হবে।

মা বাপের আদরের বিনতি কোন একদিন রামলতানের জীবনসঙ্গী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সেই ভালোবাসার মানুষটি তাকে বিয়ে করার অভয়বাণী শুনিয়ে একদিন বিদেশে চাকরি করতে চলে যায়।

> ''কিন্তু রামলতান আর এলোই না। স্বপ্নের নদীতে বিস্তর ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে কতদিন ভাত পুড়িয়ে ফেলেছে বিনতি। চা পাতা তুলতে তুলতে কতোদিন থেমে গেছে হাত। তলব নিতে ভুল করেছে। এখন আকাশের তারাগুলোর দিকে তাকায় বিনতি বুড়ি। চাঁদটাকে আর দেখা যায় না।''[১৩]

বিনতির মতো আরো অনেক মানুষকে রেললাইন বানানোর ফল ভোগ করতে হয়েছিল। সর্বস্বান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হয় পাহাড়ের নীচে জঙ্গলের ধারে। যাযাবরের মতো তাদের একস্থান থেকে আরেকস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়। বিনতি বুড়ির মাধ্যমে আসলে আরও অনেক অসহায় মানুষ যারা শিকড়চ্যুত, বাস্তুহারা, অসহায় মাটির মানুষের প্রব্রজনে ফেলে আসা ভূমির প্রতি যে বিরহ বেদনা তাই এই গল্পের অনুপস্থিত উপস্থিতি।

লেখকের বেশিরভাগ গল্পই প্রান্তিকায়িত জন বা অনান্নী অঙ্গনাদের জীবন সংগ্রামের নানা দিকে পরিপূর্ণ। প্রান্তিকায়িত বা শোষিত জন তাদের প্রতিবাদ যে ভাষা বা ভঙ্গীতে প্রকাশ করে তা অধিগম্য হয়ে উঠে লেখকের বাচন কৌশল এবং পাঠকের অন্তর্দৃষ্টির তথা পুনঃপাঠের দ্বিরালাপিক প্রয়াসে। 'অধিকার' গল্পটিতে অধিকার আদায়ের জন্য যে লড়াই তাকেই স্থান দেওয়া হয়েছে। গল্পটিতে বীরেন চরিত্রটির মাধ্যমে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বি(দ্ধে অসহায় প্রান্তিকায়িত এক দেশ নাগরিকের

লড়াইয়ের পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। ভোটে সবার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকা সত্বেও বারবার ভোট দিতে গিয়েও যখন সে তার অধিকারের সদব্যবহার করতে পারছে না তখন সে সোচ্চার হয়ে উঠে নিজের অধিকার র(ার জন্য। তাই তো সে বলে উঠে —

> "ভোট হয়ে গেছে বললে হামরা মানবো না, হামরা ভোট দিবো। এটা হামাদের গণতান্ত্রিক অধিকার।"[১৪]

ভোট দিতে গিয়ে তার ভোট দেওয়া হয়ে গেছে দেখেও বীরেন প্রথমবার শক্তি(শালী শাসকগোষ্ঠীর বি(দ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস যোগাতে পারেনি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে বীরেন শেষ পরিণতির কথা চিন্তা না করে প্রতিবাদে নেমে পড়ে এবং শাসকগোষ্ঠীর চেলাচামুণ্ডাদের তোয়াক্কা না করে নিজের অধিকার প্রয়োগে এগিয়ে আসে।

ভোটে জেতার জন্য নানা ধরণের কৌশল অবলম্বন যেন সমাজের চিরাচরিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এম এল এ সুধীরবাবুও ভোটে জেতার জন্য মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে একটুকুও কুণ্ঠিত নয়। গ্রামের মানুষদের মধ্যে টাকা বিলি করে আকণ্ঠ মদ গিলিয়ে মিথ্যা প্রশংসা কুড়াতে পথে নেমেছেন। গ্রামের অসহায়, দরিদ্র মানুষদের নানা লোভ-প্রলোভন দেখিয়ে তাদেরকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টার বি(দ্ধে বীরেনের প্রতিবাদ যেন প্রান্তিকায়িত প্রতিটি মানুষের প্রতিবাদ। সাধারণ মানুষ বীরেনের প্রতিবাদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছিল বলে তারাও তার সঙ্গে অধিকার র(ার লড়াইয়ে দলে দলে যোগদান করে। বীরেনের অধিকার র(ার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অজস্র প্রান্তিকায়িতদের প্রতিবাদের উপস্থিতি যেন গল্পের মুখ্য উপজীব্য।

গল্পকারের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পেই নারীর একটা বড় জায়গা রয়েছে। সমাজের কোন কাজে তাদের অগ্রণী ভূমিকায় দেখা যায় না, বিশেষ করে পু(ষশাসিত সমাজে। সমাজে নারীরা বঞ্চিত, শোষিত, অনুপস্থিত থাকলেও, গল্পকার তার বাচনভঙ্গীর মাধ্যমে তাঁদের একটা ঠাঁই করে দিয়েছেন। '(রণ' গল্পটিতে একটি নারী পরিবারের একান্ত

আপন মানুষটি দ্বারাই নিপীড়িত শোষিত, লাঞ্ছিত। পরিবারে তার কোন মর্যাদাই নেই। স্বামীর দ্বারা, অত্যাচারিত নিপীড়িত এক নারীর মর্মান্তিক মনোবেদনা এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। গল্পের প্রধান নারী চরিত্র সনকা এবং আরেকটি নারী চরিত্র লক্ষ্মীকে ছাড়া গল্পটি যেন অসম্পূর্ণ। অসুস্থ সনকাকে পরিবারের অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত সনকার শরীরের কষ্ট থেকে মনের কষ্টই বেশি। বিনা চিকিৎসায় তার বা হাতটা পচতে বসেছে। এমতাবস্থায় মেডিক্যালে যাওয়ার পথে যাত্রীদের নানারকম মন্তব্য তার কষ্টকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। সমাজের মানুষের নানা কটা(তাকে চিকিৎসার সামান্য সুযোগটুকু থেকেও বঞ্চিত করে। অসহ্য ব্যথা বেদনা নিয়ে বেচে থাকতে হয় বলে একদিন তার সুখ দুঃখের অংশীদার লক্ষ্মীকে বলে —

> ''আমার শরীরের কষ্টলে মনের কষ্ট আরো বেশি রে। তবু হামাকে বুকের যন্তরনা শরীরের যন্তরনা নিয়ে এই দুর্গন্ধভরা সমাজটায় বাঁচে থাকতে হয়। হামি মরলে তো কেউ কান্দবার নাই রে।''[১৫]

একদিন সব দুঃখ কষ্টকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পচা দুর্গন্ধ ভরা সমাজ থেকে সে চিরবিদায় নেয়। সনকা, লক্ষ্মী, লক্ষ্মীর ভালোবাসার মানুষ ভিনদেশীয় ব্যক্তি(টির অনুপস্থিত উপস্থিতি পাঠক সমাজের নজরে পড়ার মতো। ভিন দেশীয় মানুষটি কোথা থেকে এসেছিল লক্ষ্মী জানত না। কিন্তু তার মধ্যে শাসকগোষ্ঠীর বি(দ্ধে প্রতিবাদের যে সুর দেখা গিয়েছিল লক্ষ্মী তাতে মুগ্ধ হয়ে যায়। অসহায় অনাম্নী সনকার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে প্রান্তিকায়িত পু(ষের দ্বারা লাঞ্ছিত বঞ্চিত, নিপীড়িত আরও অনেক সনকাদের উপস্থিতি পাঠকবৃন্দের চোখকে এড়াতে পারবে না।

গল্পকারের আরেকটি গল্প 'ডাইনি'র বিষয় বস্তু অশি(িত কুসংস্কার আর অন্ধবি(্বাসের বশবর্তী মানুষদের অবস্থাটাই দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে চা জনজাতিদের মধ্যে একটা মারাত্মক কুসংস্কার ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় —

> ‘‘একটা শরীর পুড়ছে, পুড়ছে না গো পোড়ানো হচ্ছে। তাও জ্যান্ত একটা শরীর। আকাশে গলগল করে ধোয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে। মানুষের মাংসের পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে আকাশে, ঝিলে, পাহাড়ে, ধানের (েতে। ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের চেতনায়, মানুষের রক্তে(, মজ্জায়, শিরায় শিরায়। অসহায় জ্যান্ত শরীরটার আর্তনাদ শোনা গিয়েছিল কয়েকবার। এখন সব শুনশান, নিশ্চুপ।’’[১৬]

একজন নিরপরাধ মানুষকে মিথ্যা ডাইনি অপবাদ দিয়ে তাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতেও সমাজের মানুষরা দ্বিধাবোধ করেনি।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে যে দুখীয়াকে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, সেই দুখীয়াই ছিল গ্রামের মানুষের অতি কাছের মানুষ। গ্রামের মানুষের সে এতদিন বিনা স্বার্থে সেবা করে গেছে। কারো সে ছিল মাসী আবার কারো পিসি, সব থেকে বড় কথা দুখীয়া ছিল ধাই। ওর হাতেই গ্রামের অধিকাংশ মানুষের জন্ম। ধাই হলো মায়ের সমান। অথচ সেই মানুষটিকে পুড়িয়ে মারতে একটুও কুণ্ঠাবোধ করেনি সমাজের র(কেরা। দুখীয়ার একমাত্র ছেলে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে অন্নের সন্ধানে। গ্রামের মানুষই একসময় বাধ্য করে ছেলেটিকে ঘরছাড়া করে। দুখীয়া যদি গ্রামের বাপ-দাদার সম্পত্তি ছেড়ে ছেলের সঙ্গে শহরে চলে যেতো তাহলে হয়তো তার জীবনের এই ক(ণ পরিণিতি হতো না। দুখীয়াকে টেনে নিয়ে যাওয়ার সময় সে বলেছিল —

> ‘‘হামাকে কোথায় নিয়ে যাবিস গো,
> হামার ছেলেটা এখনও এলো না।’’[১৭]

সমাজচ্যুত এক নারীর সামাজিক অবস্থান এবং মাতৃত্বের সত্তা নারীর চিরন্তন মাতৃত্বের হাহাকারকে দ্যুতিত করে।

গল্পকার যেহেতু চা বাগানের জনজাতিদের এবং খেটে খাওয়া মানুষদের সুখ দুঃখ নিয়েই বেশিরভাগ গল্প লিখেছেন। 'ছিনতাই' গল্পটিও এর ব্যতিত্র(ম নয়। গল্পটির চরিত্র সুদামের মাধ্যমে পুরো সমাজের এমন একজন মানুষের উপস্থিতি ভেসে উঠে, সে সমাজের নারী জাতিদের ইজ্জত বাঁচাতে সবাইকে আহ্বান করে এবং নিজেও সে লড়াইয়ে ঝাপিয়ে পড়ে। মে(দণ্ডহীন সমাজের মানুষ যে বিনা প্রতিবাদে শাসকগোষ্ঠীর সব অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে যাচ্ছে তারই চিত্র এই গল্পটিতে পাওয়া যায়। রাজনীতির নোংরা ঘৃণ্য চেহারাই গল্পটিতে ফুটে উঠেছে। এবার যারা রাজনীতিতে পা রেখেছে তারা তাদের গদি বাঁচিয়ে রাখতে জঘন্যতম কাজটুকু করতেও দ্বিধা বোধ করে না। গ্রামের সহজ সরল নিরীহ একটি ছেলেকে নানা ধরণের লোভ প্রলোভন দেখিয়ে রাজনীতিতে পদার্পণের জন্য লেলিয়ে দেওয়া হয়। মানুষকে ভালোবাসার জন্য, মানুষের সার্বিক উন্নতির জন্য সুদাম রাজনীতিতে প্রবেশ করে তার ক(ণ পরিণতির কথা চিন্তা না করেই। তার মন চেয়েছিল রাজনীতির হাত ধরে সমাজ এবং মানুষকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার স্বপ্ন কোনদিন বাস্তবরূপ লাভ করেনি। গল্পটির মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে সমাজের উচুস্তরের মানুষরা নানাভাবে নীচু স্তরের মানুষদের নির্যাতন করে চলছে। সমাজের উচু স্তরের মানুষ মদের দোকানের মালিক শক্তি(দেখিয়ে চিন্তার পিসীর জমিনটা দখল করে নেয়। আবার ওই অসিতবাবুই একদিন চিন্তার মানসম্ভ্রম নিয়ে খেলা করে। এটা সহ্য করতে না পেরে চিন্তার প্রেমিক সুদাম অসিতবাবুর সামনে গিয়ে হাজির হয় এবং তাকে মেরে ফেলে। ফলে সুদামের জেল হয়। বিচারের প্রহসনে প্রতিবাদীর জীবন স্বপ্ন হারিয়ে যায়। এই স্বপ্নভঙ্গ বেদনারই উপস্থিতি বিচিত্র চরিত্রায়ণের মাধ্যমে এই গল্পের অন্বিষ্ট বলে মনে হয়। জেলে বসেই সুদাম জানতে পারে চিন্তা পদ্মপুকুরে ডুবে মরেছে। গ্রামেরই একজনের মুখে বলতে শোনা যায়।

> "ওরা শুধু হামাদের জমিন ছিনে নাই।
> ওরা হামাদের ইজ্জতও নেয়। হামাদের
> ভালবাসাও ছিনে নিয়ে টুনা টুনা করে।[১৮]

আদিবাসীর অনেককিছু নয়া উপনিবেশে ভাঙচুর হলেও সমাজ ও পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে নারীর ভূমিকার হেরফের হয়নি। মেয়েরা প্রচণ্ড পরিশ্রমী গার্হস্থ্য কর্মসম্পন্ন

করেও শিশু লালন পালন তথা চা পাতা তোলা থেকে বহন সবই তারা সমানতালে করে যায়। তাদের সন্তানের দায়ভারও মেয়েরা বহন করে থাকে। এমনই একটি নারীর কাহিনী 'স্পৃহা' গল্পটিতে পাওয়া যায়। মিথ্যা প্রতিবাদে গল্পের প্রধান চরিত্র মীরার স্বামী প্রকাশের জেল হয়। তার বি(দ্ধে মামলার শেষ পর্যন্ত নিষ্পত্তি হয় না। মীরা সব সামলিয়ে ছোট ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে ব্যস্ত। সংসার চালানোর জন্য, ছেলেমেয়েদের ভরণপোষণের জন্য মদ বানাতেও দ্বিধাবোধ করে না। সন্তানের জন্য সে সবকিছু করতে পারে। মীরা স্বামীর নানা অত্যাচার সহ্য করেও ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে লড়াই করে বেঁচে আছে। একেকসময় মীরা ভাবে স্বপ্নের দেশের কথা, যেখানে সবাই খেতে পড়তে পায় আর প্রতিভাগুলোর কমবেশি বিকাশ ঘটে। মীরার মতো বেঁচে থাকার যন্ত্রণায় কাউকে দগ্ধ হতে হয় না। আসলে মীরার মুক্তি(র মাধ্যমে তার যন্ত্রণার অনুপস্থিত উপস্থিতি পাঠকের দ্যোতনাকে জাগিয়ে তোলে। মীরা এমন এক দেশের স্বপ্ন দেখে যেখানে জিনিসপত্রের দাম বাড়ে না, সবাই সুখে শান্তিতে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার পায়। মীরার স্বপ্ন আসলে স্বপ্ন মরীচিকা। এখানেই গল্পটির ব্যঞ্জনা।

গল্পকার বিশেষ করে চা শ্রমিকদের নিয়েই গল্প লিখেছেন। তার প্রায় প্রতিটি গল্পে নারী চরিত্রের একটা বিশেষ গু(ত্ব রয়েছে। সমাজে নারীর স্থান, নানাভাবে নারী নির্যাতন এসব অনেক ব্যাপার তার গল্পে ঠাঁই পেয়েছে। এমনই একটি গল্প **''বিবর্ণ দ্বিপ্রহর''**। গল্পটিতে সমাজের নানা ধরণের সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। আমরা দেখি বেকার সমস্যার একটা যন্ত্রণাতো আছেই। তার উপর আজকাল পাগলের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। সমাজের নিষ্ঠুরতার জন্যই অনেক বড়লোকের ঘরের মানুষ নানা নির্যাতন বা অন্যায়, অত্যাচার দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে না পেরে পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। গল্পটিতে আমরা দেখি যে কয়েকজন যুবক পাগলদের নিয়ে চিন্তা করে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য এগিয়ে আসার যে আহ্বান জানাচ্ছে তাতে একটা অনুপস্থিত উপস্থিতির সম্ভাবনা থেকেই যায়। সমাজই মানুষের মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। সভ্যতার অগ্রগতির এই বিষময় ফল প্রান্তিকায়িত জীবনের তীব্র হতাশার মাধ্যমে জীবনের অর্থটাই আসলে নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয়। রমলী নামে মা-বাপের আদরের মেয়েটি বিনা দোষে, বিনা অপরাধে পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার পর বাবা তাকে অনেক আদর যত্ন করে বড় করে তোলে। একদিন

সে একজনকে ভালবেসে সংসার পাতার স্বপ্নও দেখে। কিন্তু তার সব স্বপ্ন একদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। একে একে মা-বাবা, ভালবাসার মানুষটিও তাকে একা ফেলে রেখে মারা যায়। এখানে গল্পটিতে এদের উপস্থিতি খুব সামান্য থাকলেও তাদের গু(ত্ব অনেক বেশি।

অন্যদিকে গল্পটিতে দেখা যায় বেকার সমস্যার একটা বিরাট জ্বালা। গল্পের প্রথমেই দেখা যায় কয়েকজন যুবক ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে হয়রান হয়ে নিজের ভাগ্যকে দুষছে। কিন্তু তাদের মধ্যেই একজন বলে উঠে —

> ''বোকার মতো কপালের দোষ দিসনারে। আমাদের সব দুঃখ কষ্টের জন্য গলা পচা মাংসে চোবানো এই সমাজটাই দায়ী। দেখছিস না আমার সারা গায়ে ক্যাকটাসের খোঁচা। বুকের ভেতর ছেঁড়া ডালিম ফুলের আর্তনাদ।''[১৯]

চোখ ভরা প্রতিবাদ নিয়ে সুদীপ বেড়িয়ে যায়। রমলীর মা-বাবা, তার ভালোবাসার পাত্র সুদীপ আর বেকার যুবকগুলোর উপস্থিতি গল্পে নতুন ব্যঞ্জনা এনে দিয়েছে। সমাজ কাঠামোর বি(দ্ধে প্রতিবাদের সুর বেজে উঠেছে সুদীপের কণ্ঠে। বেকার যুবকগুলোর অনুপস্থিত উপস্থিতি বর্তমান সমাজে বেতারত্বের জ্বালা যন্ত্রণা বুঝিয়ে দেবার প(ে যথেষ্ট।

রমলী সবাইকে হারিয়ে যখন দূরসম্পর্কের পিসির কাছে আশ্রিতা, তখনও কিন্তু সে নিরাপদ নয়। অনবরত সমাজের নোংরা চোখ তাকে লালসার শিকার বানাতে ব্যস্ত। তার অমতে পিসি পাত্র ঠিক করলে রমলী প্রতিবাদ করে এবং বিয়ে করতে সম্মত না হয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে গিয়ে কালী মায়ের সামনে নিভৃতে কাঁদতে থাকে। অপছন্দের পাত্রকে বিয়ে না করে সমাজে বেঁচে থাকার ব্যর্থ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে সমগ্র নিগৃহীত, নিপীড়িত, শোষিত নারী সমাজের অনুপস্থিত উপস্থিতি পাঠকের চেতনাকে নাড়া দেয়।

‘‘ জগাই বুড়ির উত্তরণ’’ গল্পটিতে সর্বহারা এক বুড়ির জীবন ঘটনাকে অত্যন্ত সাবলীলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমাজের নানা বিপাকে পড়ে মা-বাবা ভাই স্বামী এমনকি তার একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে ফেলা এক অসহায় নারীর মর্মবেদনা গল্পের প্রধান উপজীব্য। এককালে মা-বাবার আদুরে মেয়ে জগাই নানা বিপাকে পড়ে সব হারিয়ে শেষ পর্যন্ত ভি(াবৃত্তি করে জীবন নির্বাহ করে। সবাইকে হারিয়েও একমাত্র ছেলেটিকে বুকে চেপে জগাই সব দুঃখ ভুলে গিয়েছিল। তারপর এই সংগ্রামী জীবন। প্রলোভনের হাতছানি। তবু জগাই স্বপ্ন দেখে ভালভাবে বেচে থাকার।

গল্পটিতে নিজের দেশ থেকে বিতাড়িত এক নারীর অবস্থা যেন সেইসব উদ্বাস্তুদের অনুপস্থিত উপস্থিতিই পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করে। জগাইর স্বামী, পিতা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিল। পুরনোদিনের স্মৃতি রোমন্থন করে জগাই ভাবে, এই সাহসিকতার জন্য তো তাদেরকে মরণোত্তর পুরস্কার দেওয়া হয়নি। তখন সমাজের প্রতি, শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি জগাইর (োভ বাড়তে থাকে। যে জমিদারের অমানবিক অত্যাচারে অতীষ্ট হয়ে জগাইর বাবাকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল সে ভাবে এই মুহূর্তে যদি জমিদারের মুখোমুখি হতে পারতো, তাহলে ওকে ছিড়ে ফালা ফালা করে দিত। আর বাংলোয় কাজ করার সময় জগাই তো নিজের চোখেই দেখেছে শ্রমিকদের কাছে বড় বড় বক্ত(তা ঝেড়ে ইউনিয়নের নেতাগুলো কেমন মালিকের সাথে খোশগল্প করে আর এক টেবিলে খায়। জগাইর মনে যে (োভ তা যেন সমগ্র বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, অবহেলিত, পীড়িত মানুষের মনের জ্বালারূপে পাঠকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। যেন সবার কণ্ঠ, সকলের মিলিত প্রতিবাদেরই একরূপ।

চা জনজাতিদের প্রতিটি বিষয়ে গল্পকারের যে সজাগ দৃষ্টি ছিল তার গল্পগুলি থেকেই আমরা তার পরিচয় পাই। তার প্রত্যেকটি গল্পেই চা জনজাতিদের সমাজের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। হয়তো তিনি নারী বলেই নারীদের সমাজের অবস্থান, নারীদের নানাধরণের সমস্যা তার গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। ‘লগন মাঝি’ গল্পটিতে আমরা দেখি গল্পের প্রধান পু(ষ চরিত্র লগন মাঝি সংসারের নানা টানাপোড়েনে চৌদ্দ বছরের মেয়ের আশা-আকাঙ(াকে বিসর্জন দিয়ে বিয়ে দিয়েছিল একটা চল্লিশ বছরের লোকের সাথে। সমাজের মানুষই তা ঠিক করে দেয়। বিয়ের খরচের জন্য শঙ্করবাবুর কাছ থেকে তাকে ধারও নিতে হয়েছে। এর পরিণাম স্বরূপ চৌদ্দ বছরের মেয়ে পনেরোয়

পড়তেই একটা একমাসের বাচ্চা নিয়ে জগনের কাছে ফিরে আসে। অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ে দেওয়ার পরিণতি তাদের ভোগ করতে হয়। একদিন লগনের বউও মারা যায়। তারপর মেয়েটাকে বাগানের পাতি তোলার কাজে লাগিয়ে দেয়। মেয়েটাও একদিন ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। অর্থের অভাবে সে তার মেয়ের কোন চিকিৎসা করাতে পারেনি। অভাব অনটনে পড়ে দ্বিগুন বয়সের লোকের সঙ্গে বিয়ে দিতে বাধ্য কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার অনুপস্থিত উপস্থিতি পাঠক সমাজের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ। লগনের মেয়ের ক(ণ পরিণতির জন্য শাসকগোষ্ঠীই দায়ী। সমাজের মান মর্যাদা র(ার তাগিদে নারীর মান মর্যাদাকে ধূলিসাৎ করে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার মাধ্যমে অজস্র নিরীহ, নিপীড়িত, আত্মমর্যাদা র(ায় অসমর্থ নারীর অনুপস্থিত উপস্থিতিই ল(্য করা যায়।

অন্যদিকে গল্পটিতে ভারত স্বাধীনতার একটা ইঙ্গিতও আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী সুরৎ মাস্টারের কথা মনে পড়তেই এই বুড়ো বয়সেই লগনের আরেক দফা রক্ত(গরম হয়ে যায়। মাস্টার লুকিয়ে লুকিয়ে কাগজ পড়ত, ছেলেদের বিপ্লবী গান শিখাত, বলতো ইংরেজ তাড়ানোর কথা, বলতো দাসত্বের কথা, পরাধীনতার কথা। হকিন্স সাহেবের খানসামা লগনও একদিন বুটের লাথি খেয়ে মাস্টারের দলে ভিড়েছিল। ইংরেজ তাড়ানোর স্বপ্ন দেখত লগন। আর একদিন তার স্বপ্ন সত্যিও হয়েছিল। কিন্তু পরাধীনতার দশ বছর পর যখন শংকরবাবুর কাছে হকের পয়সা চাইতে গিয়ে পেটে লাথি খেয়েছিল, তখন সে বুঝতে পারল এই স্বাধীনতার জন্যই তারা এত লড়াই করেছিল! পেটের (ুধা মেটানো এখনও দায় হয়ে পড়েছে। গল্পটিতে ২৬ শে জানুয়ারি দিনটি যেন প্রহসনে পর্যবসিত করে এক উৎসবের রূপ দেওয়া হয়েছে। লগন তার সঙ্গে সবাইকে গলা মিলিয়ে বলতে অনুরোধ করে —

> ‘‘হামরা এমন এক স্বাধীনতা চাই যাতে হামাদের পেটের (ুধা মিটে। এমন এক স্বাধীনতা চাই যাতে শংকরবাবুদের লাথি খেতে হয় না। হামরা এমন স্বাধীনতা পাই যাতে হামাদের শ্রমের পুরো দাম পাই।[২০]

''বন্যার চাঁদ'' গল্পটিতে একশ্রেণি লোভী মানুষের উল্লেখ আছে যারা বন্যায় (তিগ্রস্ত বাস্তুহারাদের জন্য নিয়ে আসা রিলিফের চাল, ডাল আটা আত্মসাৎ করে। অথচ যারা এই অমানবিক কাজ করে তাদের কোন সাজা হয় না। শুধু তাদের সঙ্গে থাকার জন্য পিয়ারির ঘরের মানুষটাকে জেলে যেতে হয়েছে। উচুস্তরের মানুষ তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য নানা প্রলোভন দেখিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে কাজে লাগাচ্ছে। এখানে অবহেলিত এবং অবদমিত শাসকগোষ্ঠী দ্বারা নিপীড়িত সমাজের নীচু স্তরের সর্বহারাদের অনুপস্থিত উপস্থিতি এমনভাবে নজরে আসে যাদের অনুপস্থিত বলে মনেই হয় না।

বন্যায় আত্র(ান্ত কাজরী বন্যায় স্বামীকে হারিয়ে দুই ছেলেকে নিয়ে ঘরে ফেরে এবং বিশ পঁচিশ দিন পর ঘরে এসে দেখে কিছুই আর আগের মত নেই। সব যেন বন্যার জলে ধূয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। গল্পটির মুখ্য চরিত্র কাজরীর অদম্য সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সে বন্যায় ঘর-বাড়ি, ছাগল গ(হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। সব থেকে বড় ব্যথা সে তার ঘরের মানুষটাকে চিরদিনের মতো হারিয়ে ফেলেছে। কত সাধ করে স্বামীর সঙ্গে সংসার পেতেছিল। কিন্তু ভয়াল বন্যা তার স্বামীকে ছিনিয়ে নিয়ে তার সুখের সংসারকে তছনছ করে দিয়েছে। তার মুখ থেকে শুনা যায় —

'' সবের তো খালি ঘর গেলোরে
পিয়ারি। কিন্তু হামার যে ঘরের মানুষটাও গেল।
এই সর্বনাশী গোলা হামার সব খাইল।''[২১]

কাজরীর বাচ্চা দুটো মায়ের গলা ছেড়ে কচি-কচি হাত দিয়ে চোখের জল মুছে। ওরাও অবাক হয়ে পিয়ারিকে দেখে। চা শ্রমিকদের আর্থিক সংকট সবসময়ই থাকে। সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করার পর পাওয়া পারিশ্রমিক দিয়ে সংসার চালাতে ওদের কষ্ট হয়। পেট ভরে দুমুঠো খাবারও তারা জোগাড় করতে পারে না। আর্থিক দৈন্যের পরিচয় এই লাইনগুলো থেকেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

'' উঠোনের মধ্যে খড়কুটো জ্বালিয়ে
কাজরী রিলিফের আটা দিয়ে (টি তৈরি করে।

(টিগুলো সেদ্ধ হয় না। তবু সেই আধাসেদ্ধ
(টিগুলো কচি কচি হাত দিয়ে ছেলেগুলো মহা
আনন্দে খায়।''[২২]

কাজরীর স্বামী যেদিন মারা যায় সেদিন আকাশে মস্ত একটা চাঁদ উঠে। আর ওই চাদের আলোয় তার দুনিয়া আলোকিত না হয়ে বরং অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে যায়। দশ বছর যে মানুষটার সাথে এক হয়ে কাটালো কাজরী তার সেই দশ বছরের সুখ দুঃখ হাসি কান্না মান-অভিমানের আজ অবসান হয়ে গেলো। পূর্ণিমার সেই মস্ত চাঁদ যেন তাঁর জীবনে রা(সের বেশে প্রবেশ করে সব শেষ করে দিয়েছে।

চা জনজাতিদের জীবনের একটি বাস্তব চিত্র আমরা দেখতে পাই 'দেয়াল' গল্পের নায়ক বনমালির মধ্য দিয়ে। পরের উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবনকে নরক বানিয়ে দিয়েছে বনমালি। চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছ মা-বাবার স্বপ্নকে, ভাই-বোনের আশা ভরসাকে। বাবা নিজের চাষের জমি বিত্রি(করে ছেলেকে শহরের হোস্টেলে রেখে বি.এ পাশ করিয়েছে। পড়াশুনা করে চাকরি করে সংসারের দুঃখ ঘুচাবে এই আশায় মা-বাবা নিজেরা অনেক কষ্ট করে তাকে পড়াশুনা শিখিয়েছে। কিন্তু সমাজের অসহায় এক পরিবারকে সাহায্য করতে গিয়ে মানুষের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'বার জেল ঘুরে এলো বনমালি। তার বাবা একদিন বলেছিল —

''দেখ বাবা তুই লেখাপড়া শিখেছিস,
নিজের আখের খালি গুছাস না। মানুষের
লাগিন কিছু করিস। নিতাইকে দেখ, ভরতকে
দেখ, লেখাপড়া শেষে নেতা সেজে কেমন
মানুষের সর্বনাশ করছে।''[২৩]

বনমালি তাই ভালো হতে চেয়েছিল। ভালো হয়ে মানুষের দুঃখে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার জীবনের এই ক(ণ পরিণতি। শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা নিপীড়িত বনমালি যেন শোষিত সমাজের চিহ্(ায়ক রূপ নিয়ে পাঠককে আকৃষ্ট করে। তার প্রতিকারহীন প্রতিবাদ ব্যঞ্জিত হয় অনুচ্চারিত দ্যোতনায় ।

'চেতনায় আচমকা ডালিমফুল' গল্পটিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের উপরে কুঠারাঘাত করে শিল্প গড়ে তোলার ফলে যে ভয়ানক পরিণতি সেটাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাধারণত শমিতা, মেনকা সুজলা যে জনজীবন থেকে উঠে এসেছে, তাতে অর্থনৈতিক একটা সংকট সবসময়ই দেখা যায়। ঘুম থেকে উঠে সারাদিন পরিশ্রম করার পর দুমুঠো অন্ন জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ে। এদের মধ্যে একটু ব্যতিত্র(ম দেখা যায় শমিতাকে। কাজে যায় দুমুঠো অন্নের জন্য, সামান্য অর্থের জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে। তারপরও (ুধার পীড়নে তার শিল্পীসত্তা মরে যায়নি। সে প্রযুক্তি(কে পর্যবে(ণ করে, আকাশের দিকে তাকায়। ভাল লাগার আশায়। ভালবাসাকে সে চিহ্নি(ত করে ডালিম ফুলের সঙ্গে। প্রকৃতির দিকে চোখ মেলে দেখে আর ভাবে পরিবর্তন তো স্বাভাবিক। কৃষির স্থান নিচ্ছে শিল্প। শিল্প যে ধীরে ধীরে প্রকৃতিকে গ্রাস করে নিচ্ছে তার জন্য (োভ হয় শমিতার। শিশু বয়সে তার মনে ভালবাসার ফুল ফুটে, সমাজের চাপে শিল্পের চাপে তা তছনছ হয়ে যায়। সারাটা জীবন তাদের শ্রমজীবী হয়ে কাটাতে হয়। ফলে একটা প্রতিবাদ তাদের মধ্যে জেগে উঠে। শিল্পের বি(দ্ধে প্রতিবাদ করে তারা যেন একমুঠো মুক্ত(বাতাস আনতে চায়।

''স্বপ্নগন্ধার খোঁজে'' ঝুমুর পাণ্ডের দ্বিতীয় গল্প সংকলন। সংকলনের গল্পগুলোতে কথাকারের সত্তা যেন সম্পূর্ণ দুটো আলাদা পরিচিতি নিয়ে আমাদের সামনে হাজির। প্রথমোক্ত(গল্পে কথাকার তাঁর চা বাগান সংস্কৃতি সমৃদ্ধ সত্তা উজার করে দিয়েছেন। আর দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত(গল্পে আছে এক পরিশীলিত মার্জিত শি(িত কথক যিনি আধুনিক সুশীল সমাজের সময় ও পরিসরে দ(তায় বিচরণে পারঙ্গম। ''বেলবতী'' রূপান্তর, বিবর্ণ জ্যোৎস্নায়, সরস্বতীয়ার সুখ-দুঃখ প্রভৃতি গল্পগুলি বাগান সংস্কৃতির প্রকার প্রকরণে জারিত। [২৪]

চা জনজাতিদের সমাজের নারীর ভূমিকা অনেক(ে ত্রে গু(ত্বপূর্ণ। কোনো কোনো সংসারে দেখা যায় নারী সাংসারিক এবং রোজগারের দিক সামলাচ্ছে। সবদিক সামলিয়ে নিয়ে যেতে যেতে সে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। নিজের সুখ দুঃখ, আশা-আকাঙ(াকে পেছনে রেখে বাকী সবার জন্য নিজেকে নিঙড়ে দেয়। এমনই একটি গল্প 'সুভদ্রা, মেয়েটা, সাদাশাড়ি এবং....'' । গল্পটিতে সুভদ্রার স্বামীর উপস্থিতি নেই। স্বামীহারা হয়েও সুভদ্রা হাল না ছেড়ে একমাত্র মেয়েকে আ(াদে আবদারে বড় করে

তুলেছে। আদরের মেয়েটিকে পড়াশুনা করানোর ইচ্ছাও সুভদ্রার মনে জাগে। সুভদ্রার ইচ্ছা মেয়ে লেখাপড়া শিখে বাগানে চা পাতা তোলার কাজ না করে ভাল একটা কিছু ক(ক। আদরের মেয়ের বিয়ের পণের টাকা জোগাড় করতে সুভদ্রাকে জমি বিত্রি(করতে হয়েছে। সুভদ্রার এ ক(ণ অবস্থার মধ্য দিয়ে অনেক মা-বাবা আছেন যারা পণের টাকা জোগাড় করতে না পেয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারেন না। এখানে সামাজিক ব্যাধি পণপ্রথার শৃঙ্খলে বন্দী অসহায় মানুষের হাহাকার প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বাধীনতার এত বছর পরও তারা পরাধীনতার বেড়াজালে আবিষ্ট। তাদের কাছে স্বাধীনতার পরবর্তী শাসন থেকে পূর্ববর্তী শাসনই ভাল ছিল। শাসকের পরিবর্তনেও শোষণের মাত্রা একই আছে। তখনও তারা পরাধীন ছিল এখনও তারা পরাধীন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপল(্যে স্বর্ণজয়ন্তী পালন করা হবে। কিন্তু বেলবতী, সত্যভামা জানেই না স্বাধীনতা কি জিনিস। 'বেলবতী' গল্পটিতে স্বাধীনতা লাভ করে পরাধীনতার যে একটা অনুপস্থিতি উপস্থিতি তা যেন ভেসে উঠে। স্বাধীনতা শব্দটি যে বিদ্রূপাত্মক ইঙ্গিত নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বেলবতীর সাত বছরের ছেলে একটি দু'বছরের বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রায় পঙ্গু হয়ে যায়। সবাই বলে সাহসিকতার জন্য সে মেডেল পাবে। বেলবতীর মনেও আশা জাগে। কিন্তু পরমূহূর্তেই তা চুরমার হয়ে যায়। স্বর্ণজয়ন্তী উপল(মঞ্চে যখন সমাজের দোষী ব্যক্তি(দের দেখে, বেলবতীর তখন মনে হয় বীভৎস, ভয়ানক, কুৎসিত সব পোকাগুলো মঞ্চে কিলবিল করছে। পোকাগুলো যেন সবদিকে ছড়িয়ে সমাজকে নষ্ট করে দিচ্ছে। পোকায় পোকায় যেন সব পরিপূর্ণ।

ভালোবেসে বিয়ে করে সমাজের নিষ্ঠুরতার দ(ণ একদিন সর্বস্বান্ত হয়ে একমাত্র ছেলেকে আঁকড়ে ধরে বাচার লড়াই চালিয়ে যায়। সামাজিক দিক থেকে তার তেমন কোন মর্যাদা নেই। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল বলে বাবার বাড়ি বা শ্বশুরবাড়ি কোথাও তাঁর ঠাই হয়নি। এমনই এক নারীর সমাজের চাপে পড়ে অসহায়ত্বের চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। 'আবর্ত' গল্পটিতে কলেজে পড়া শ্যামলী ভালোবেসে বিয়ে করে বিষাণকে। দুজনের ভালোবাসাকে সুখী সংসারে পরিণত হতে দেয়নি সমাজ। জাতপাতের বিভেদকে ভালোবাসা না মানলেও সমাজ যে জাতপাতের নামে অনেক নির্মম কাজ করতে পারে তার পরিচয় পাওয়া যায় গল্পটিতে। শ্যামলীর একদিন ছিল প্রবল

আত্মসম্মান। কিন্তু সমাজের অত্যাচারে একটু আশ্রয়, — আর নিরাপত্তা না পেয়ে তার জ্ঞান, বুদ্ধি, চেতনা ব্যক্তি(ত্ব ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। এখন সে একমাত্র ছেলেকে কোলে নিয়ে ভি(া করছে। নারীর শেষ সম্বলটুকু নিয়েও তারা ছিনিমিনি খেলে। নারীর অমঙ্গল কামনা করে অপর এক নারী। সমাজে নারী নানাভাবে নির্যাতিতা। তাইতো রমলার মাসী বলে পু(ষ মানুষ একটু আধটু দোষ থাকবেই। কিন্তু যার কোনও কূলে ঠাঁই নাই, তার অতো সতীপনা করলে সাজে'। রমলার উপর নানাভাবে চলে অত্যাচার। এই অত্যাচারের পেছনে থাকা শাসকগোষ্ঠীর অনুপস্থিত উপস্থিতি লেখকের বাচন বিন্যাসের মাধ্যমে পাঠকের সজাগ দৃষ্টিকে এড়াতে পারেনি।

''সরস্বতীয়ার সুখ দুঃখ'' গল্পটিতেও শাসকগোষ্ঠীর নির্মম অত্যাচারের ফলে একটি নারীর জীবনে নেমে আসে ক(ণ পরিণতি। গল্পটির প্রধান চরিত্র সরস্বতীয়ার বাবা শাসকগোষ্ঠীর বি(দ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যায়। একমাত্র মেয়ের মঙ্গল কামনায় সরস্বতীয়ার মা জাগরণ করত। অথচ সেই মার অসুস্থতার সময় টাকার অভাবে একটু চিকিৎসা করাতে পারেনি সরস্বতীয়া। কিন্তু মরার পর জাত পরমিনকে ভোজ দিতে হলে ভিটেটা বাঁধা রাখে। সমাজে থাকলে এসব করতে হয়। হঠাৎ যেন তার কাছে সব পাল্টে যায়। পাল্টে গেছে সরস্বতীয়ার সেদিনের ভালবাসার ছেলেটাও। একদিন বাঁশী বাজাত। আকাশের রঙ দেখতো। দেখতো পাখি আর ফুল।

> ''সময়টা কেমন নিষ্ঠুরভাবে সুন্দরকে হত্যা করছে। আবার একটা পরম সুন্দরকে পাওয়ার জন্য পা পা করে এগোচ্ছে(এজন্যই প্রতি মুহূর্তে সুন্দরের এই হত্যা।''[২৫]

একটুখানি সুখের আশায় সরস্বতীয়ার সারাজীবন লেগে গেল, তবুও হয়তো সুখের সন্ধান মিলবে না। কিন্তু তারাও স্বপ্ন দেখে একদিন সবার সুখ হবে। সুখের আশায় আশায় দিনগুনা অজস্র সরস্বতীয়াদের অনুপস্থিত উপস্থিতি গল্পটিতে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে।

আলোচিত গল্পগুলি ছাড়াও ''বিবর্ণ জ্যোৎস্নায়'', ''জা(ল ফুলের মাস'', ''রাইত পোহাউক'' প্রভৃতি গল্পেও অনুপস্থিত উপস্থিতির একটা জায়গা রয়ে গেছে।

এবার আমরা লেখকের তৃতীয় গল্প সংকলন 'সুখ গাছের গল্প' এবং কয়েকটি অপ্রকাশিত গল্প বি(-ষণ করে তার মধ্যে অনুপস্থিত উপস্থিতিকে চিহ্নি(ত করার চেষ্টা করব। লেখকের প্রায় প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যেই আমরা অনুপস্থিত উপস্থিতিকে খুঁজে পাই। তৃতীয় সংকলনের প্রথম গল্পটির নাম ''মো(দা সুন্দরীর হারানো প্রাপ্তি''গল্পটিতে মো(দার সবকিছু হারিয়ে গিয়ে জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকার অসহায়ত্বকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মা, মাটির কথাই গল্পটিতে ভেসে উঠেছে। এই গল্পটিতে এক অনাম্নী অঙ্গ নার জীবনের ঘটনাকে এমনভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যা পাঠকসমাজের কাছে জীবন্ত চিত্ররূপে ভেসে উঠে। গল্পটিতে দেশ ছাড়ার মর্মবেদনা ফুটে উঠেছে মো(দার জীবনচরিত্রের মাধ্যমে। দেশ বিভাজন ছিনিয়ে নিয়ে গেল মো(দার সবকিছু। মা, বাবা, স্বামী একমাত্র ছেলে সবাইকে পেছনে ফেলে নিয়তির বশবর্তী হয়ে শেষ পর্যন্ত মো(দার ঠাঁই হয় এক রিলিফ ক্যাম্পে। একদিন যার সবকিছু ছিল, ভাগ্যের দোষে সারাটা জীবন তাকে যাযাবরের অসহায় জীবন কাটাতে হয়। রিলিফ ক্যাম্পে থাকা অবস্থায় বারবার তার ছেলে খোকনের মুখটা তার স্মৃতিতে জায়গা করে নেয়। ষোল বছরের বিধবা মেয়েকে কাশীতে রেখে এসে শান্তি পায় না মো(দার (াশুড়ি। বিধবাদের ক(ণ পরিণতি এই চরিত্রটির মাধ্যমে বোঝা যায়। মো(দার (াশুড়ির মাধ্যমে মমত্ববোধের চেহারার অনুপস্থিত উপস্থিতি পাঠক সমাজের চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। পাঠকের সজাগ দৃষ্টি গল্পের অনুপস্থিতি উপস্থিতিকে ঠিক চিহ্নি(ত করতে পারবে।

লেখকের প্রতিটি গল্পের মধ্যে শোষিত প্রান্তিকায়িত অনাম্নী অঙ্গনাদের জীবনযুদ্ধের চিত্র ফুটে উঠেছে। বিনাদোষে সমাজের নানা দিক থেকে তারা শোষিত, লাঞ্ছিত। এমনই এক নারী শ্রীমতীর জীবনের হৃদয়বিদারক নানা দিক নিয়ে লেখা গল্প '' শ্রীমতী চলে''। সমাজের মানুষের হাত থেকে নিজের সম্মান বাঁচাতে সে একদিন ভতু ডাকাতকে খুন করে জেলে যায়। যে স্বামীর কথায় একদিন নিজের সম্মান র(ায় ভতু ডাকাতকে খুন করেছিল, জেল থেকে ফিরে এসে দেখে নিজের মানুষটি শ্রীমতীকে ভুলে অন্য এক নারীর সঙ্গে সংসার করছে। সে তখন দুঃখে ঘৃণায় অপমানে বলে কার জন্য ইজ্জত বাঁচিয়েছিল। সমাজে এমন অনেক নারী আছে যারা নিজের কথা

চিন্তা না করে স্বামীর মান সম্মান র(ার্থে যে কোনও কিছু করতে প্রস্তুত। অথচ প্রত্যুত্তর সে খালি হাত। কোনও কিছু তার হাতে থাকে না। সে সবকিছু হারিয়ে ফেলে। শ্রীমতী চরিত্রটির মাধ্যমে এমনই অনেক অনাম্নী অঙ্গনাদের জীবনচিত্র আমাদের সামনে উপস্থিত করতে লেখক স(ম হয়েছেন বলে আমাদের মনে হয়। জেলে বসে অনেক মানুষের সঙ্গে শ্রীমতীর আলাপ হয়। সেখানেও সুধন্য নামে এক ব্যক্তি(শ্রীমতীকে প্রেম নিবেদন করে। কিন্তু তখন শ্রীমতীর বুকে সমস্ত অস্তিত্বে হাসছে শ্রীদাম। পাপ হবে বলে এরপর আর সুধন্যর সঙ্গে কথাই বলেনি শ্রীমতী। যে স্বামীর জন্য শ্রীমতী এতটুকু করেছে সেই সুদাম যখন শ্রীমতীকে ভুলে অন্য নারীর সঙ্গে সংসার বাঁধে তখন সংসারের প্রতি, স্বামীর ভালবাসার প্রতি একটা বিরূপ ভাব শ্রীমতীর মনে জেগে উঠে।

লেখকের আরেকটি গল্প। ''স্বপন কথা'' গল্পটির মধ্যে অনুপস্থিত উপস্থিতির একটা দ্বন্দ্ব ল(্য করা যায়। গল্পটি কোনও সংকলনের নয়। গল্পটি আমি সংগ্রহ করেছি ''দূরের খেয়া'' থেকে। গল্পটিতে চা শ্রমিকদের স্বাধীনতার আশায় পালিয়ে যাওয়ার পথে রেল থেকে স্টিমার উঠার সময় গোরা সেনাদের গুলি খেয়ে মৃত্যুবরণের মাধ্যমে অজস্র স্বাধীনতা লাভের আগ্রহী চা শ্রমিকদের ছবি সবার সামনে ভেসে উঠে। বন্যা আসছে, সবদিকে হাহাকার, জল যেন রা(সের মতো তেড়ে আসছে। এর মধ্যে স্বপ্ন দেখে দুখীরাম। শুধু চোখে স্বপ্ন নেই দুখীরামের ছেলে দুলারামের। দুখীরামের সব স্বপ্ন যেন মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। দুলারাম স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দিয়ে বুড়ি দাদির সব আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে সমাজবিরোধীদের সঙ্গে মিলে মিশে নানা রকম কাজ করতে থাকে। দুলারামের বাবা ওকে স্কুল মাস্টার বা পিয়ন বানাতে চেয়েছিল। কিন্তু যেহেতু তার কোনও স্বপ্ন নেই সেজন্য দুলারাম বাস্তব জীবনের বাস্তবতাকে নিয়েই নানারকম সমাজবহির্ভূত কাজ করে। সমাজবিরোধীদের চামচাগিরি করে, নানারকম মস্তানি করেই বেঁচে থাকতে চায়। এভাবে কত নবযুবক যে বিপথে চলে যাচ্ছে তারই একটা অনুপস্থিত উপস্থিতির আভাস পাওয়া যায় দুলারামের জীবনচরিত্রের মধ্য দিয়ে।

''বিপন্নতার গল্প কথা'' গল্পটিতে সমাজের একটি জ্বলন্ত সমস্যা নিয়ে লেখা হয়েছে। উগ্রপন্থীরা অনেক নিরপরাধ মানুষকে পণবন্দী করে রাখে তারই ক(ণ বর্ণনা পাওয়া যায় গল্পটিতে। গল্পটিতে কিষ্টমণি তার তেরো বছরের নাতিকে দোকানে পাঠায় দৈনন্দিন জিনিসপত্র আনার জন্য। রাত গড়ায়। কিষ্টমণি নাতির অপে(ায়

চঞ্চল হয়ে উঠে। নাতি আর ফিরে আসে না। তার সংশয় বাড়তে থাকে দোকানের দিকে থেকে গুলির শব্দ শুনে। বিনাদোষে কিষ্টমণির তেরো বছরের নাতির দেহ লুটিয়ে পড়ে। সমাজবিরোধীদের এরকম কাজের জন্য কত নিরপরাধ মানুষ মারা যাচ্ছে এবং তাদের পরিবার দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত হচ্ছে তারই একটি অনুপস্থিত উপস্থিতি আমাদের সামনে ভেসে উঠে।

বোনাসের জন্য সংগ্রাম করতে গিয়ে কিষ্টমণির বাবাও একদিন ম্যানেজারের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিল। একমাত্র সম্বল নাতিকে আঁকড়ে ধরে সমাজে বাঁচার জন্য লড়াই করে যাচ্ছিল। কিন্তু সমাজের জনাকয়েক অপরাধীদের কুকর্মের ফলস্বরূপ তার সংসারে বেঁচে থাকার একমাত্র সম্বলটুকুও তাকে ছেড়ে অকালে চলে যায়। এমন অনেক কিষ্টমণি আছেন যারা অসহায়, নিরপরাধ হয়েও অপরাধের ফল ভোগ করছে। এখানেই গল্পটির ব্যঞ্জনা।

''কৃষ(মণি হাটে'' গল্পটিতে জাতি দাঙ্গার ফলস্বরূপ নিরপরাধ অসহায় মানুষদের যে কষ্ট সহ্য করতে হয় তারই চিত্র পাওয়া যায়। বিনা দোষে দাঙ্গাবাজদের হাতে অনেক মানুষ প্রাণও হারায়। একই গ্রামে পাশাপাশি হিন্দু মুসলমানের বাস। কৃষ(মণি ভেবে পায় না কেন দাঙ্গাবাজরা মানুষের সুখ শান্তিতে আগুন লাগায়। নিরপরাধ মানুষদেরকে মেরে তারা সমাজের বা দেশের কোন মঙ্গল করছে না, এটা তারা বুঝতে চায় না। গল্পটির প্রধান নারী চরিত্র কৃষ(মণি। বিয়ের পর স্বামীর ঘরে সুখে থাকতে না পেরে তার বাবার সংসারে চলে আসতে বাধ্য হয়। সেখানেও বাপ মা- বোনের সংসারের ঘানি কৃষ(মণিকেই টানতে হয়। সে ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁশের আড়তে কাজ করে। বাঁশ বেধে পাঁচগ্রামের পেপারমিলে পাঠানো হয়। একা কৃষ(মণিকে কাজ করতে দেখে ঠিকাদার সুরত আলি তাই চমকে উঠে আসে '' মেয়ে মানুষ কেমনে বাণ্ডিল কাম করব। সংসারের সুখের জন্য, সবার অন্ন যোগানোর জন্য কৃষ(মণি এমন কঠিন কাজও করতে পারে। তার এই অদম্য সাহসিকতা, কাজ করার ইচ্ছাকে সংসারের প্রতি দায়িত্ব পালনের কর্তব্যকে শুধু মেয়ে মানুষ বলে উড়িয়ে দেওয়া হয়। পু(ষতান্ত্রিক সমাজে নারী সব সময়েই নিগৃহীতা। নির্দিষ্ট ঘেরাটোপ থেকে বেড়িয়ে এসে কৃষ(মণির মতো মেয়েরাও পরিবারের জন্য কিছু একটা করতে চায়। এমন অনেক নারীই তাদের সংসারের ঘানি টানতে কঠিন থেকে কঠিনতর কাজ করতে আজকাল আর পিছপা

হয় না। কৃষ(মণি তাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে এবং সমাজের চোখের পাতাকে কিছুটা নড়ানোর চেষ্টা করছে। কৃষ(মণির মন এতই কোমল যে দাঙ্গাবাজদের আত্র(মণে অনেক মানুষ মারা যায়, তাদের জন্য তার মন খারাপ হয়ে যায়। সে ভেবে উঠতে পারে না, দাঙ্গাবাজরা কিসের জন্য খুনাখুনি করে মরছে। তার মধ্যে অদম্য সাহসিকতারও পরিচয় পাওয়া যায়। যখন আমরা দেখি কার্ফুর মধ্যেও অসুস্থ বাবার জন্য সে ওষুধ আনতে বেড়িয়ে যায়।

এবার আমার যার গল্পের মধ্যে অনুপস্থিত উপস্থিতিকে অন্বেষণ করার চেষ্টা করব তিনি হলেন এতদঞ্চলের আরেক মহিলা গল্পকার দীপ্তি দেব। সাধারণত কবিতা দিয়ে লিখনকর্মের সূচনা হলেও মুখ্যত ছোটগল্পই তার লেখার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। জীবনপথে চলতে গিয়ে তিনি যাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন, যাদের জীবনের সুখ - দুঃখ, আশা-নিরাশা-হতাশা-বেদনা তার হৃদয় বীণার তারে ঝংকৃত হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই চা বাগানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। চা বাগানের পরিবেশ সেখানকার মানুষের সুখ, দুঃখ আশা আকাঙ(াকে তিনি খুব কাছ থেকে প্রত্য(করে তার গল্পের মধ্যে তাদেরকে আলাদা জায়গা করে দিয়েছেন। তিনি তার সাধ্যমত গল্পের বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে তোলার প্রয়াস করেছেন।

২০০৫ সালে তার প্রকাশিত গল্প সংকলন 'পয়মন্ত' এর নির্বাচিত কয়েকটি গল্পের মধ্যে আমরা অনুপস্থিত উপস্থিতিকে চিহ্নি(ত করব। এই গল্প সংকলনে 'চা বাগানের বিরজুলাল' গল্পে নিরপরাধ বিরজু সমাজের তথা শাসকগোষ্ঠীর শিকারের ঘোরপ্যাচে পড়ে নিজের জীবনের মানেটাকেই হারিয়ে ফেলেছে। মিথ্যা চোর অপবাদ নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে জেলে যায়। নিজের কোন অপকর্মের দোষে জেলে যায়নি বিরজু। তবুও জেলে হাড়ভাঙা খাটুনিতে মোটেও তার কোনও আপত্তি ছিল না, জেলের এই দীর্ঘ ছ'মাস তার কাছে অসহনীয় মনে হয়নি। কারণ সেখানে জুটত মোটা চালের ভাত। তা জুটানোর জন্য কোনো দুর্ভাবনা তাকে করতে হয়নি। বিরজু জেল থেকে ফিরে এসেছে। তার পরিবার যেন তবুও হতাশাগ্রস্ত।

ছেলেমেয়েগুলো সামান্য খুশী হলেও তার বউ তিশোমণির মনে যেন কোন আনন্দই নেই বিরজু ফেরার ঘটনায়। জেল থেকে ফিরে এসে কোন কাজ না পেয়ে

শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তার (োভ বাড়তে থাকে। এদের জন্যই নিরপরাধ বিরজুর আজ এই ক(ণ পরিণতি। বিরজুকে চোর বানিয়ে এরকম গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়। বিরজু যেতে যেতে চিৎকার করে। ''হামি চোর নেহি লেকিন হামাকে তোরা চোর বানালি..... হামি তব....।[২৬]

''একটি কুড়ি দুটি পাতার দেশে'' গল্পটিতে শাসকগোষ্ঠীর বদল হয়েছে। তবুও চা শ্রমিকদের অত্যাচার ও নিপীড়নের ইতিহাস তেমনি রয়েছে। দেশিয় বণিকরা চা বাগানগুলো কিনে নেওয়ার পরও সুরজলালের মতো জনদরদী মানুষকে বিনা দোষে মৃত্যুবরণ করতে হয়। দেশীয় বণিকরা চা বাগান কিনে নেওয়ার পর শ্রমিক ছাটাই শু(করলে পঞ্চায়েত সেত্রে(টারি সুরজলাল শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার পাইয়ে দিতে বদ্ধ পরিকর।

শ্রমিক সন্তানরা যাতে লেখাপড়া শিখে মালিকের কারসাজির বি(দ্ধে (খে না দাঁড়ায় তার জন্যই একমাত্র শি(া প্রতিষ্ঠানটি চত্র(ান্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শ্রমিকদের সবদিক থেকে যেন একেবারে অকেজো করে রাখা হয়। তাদের যেন শি(া অর্জনের অধিকারটুকুও নেই। চিকিৎসালয়টি বন্ধ করে দিলে শ্রমিকদের রোষের মুখে পড়তে হবে ভেবে নামমাত্র চিকিৎসালয়টি চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দেয় দেশীয় মালিক। সুরজলাল শ্রমিকদের জন্য এত ভাবত তার পরিচয় পাওয়া যায় মৃত্যুকালে ডাক্ত(ারকে দেওয়া তার বক্ত(ব্যে —

> '' ডাক্ত(ারবাবু ওদের আপনি বলবেন তাদের সুরজভাই মরলেও তাদের সাথমে থাকবেক। যিতনা দিন উহারা সব আদমী লোককে কাম নাই দিবেক। উহারা ঘাবড়িয়ে যেন হরতাল বন্ধ না করে। কিউ করবেক ডাক্ত(ারবাবু, ভুখে মরবেক নাকি ইতনা দুখিয়া আদমী.....।''[২৭]

মরতে মরতেও জনদরদী সবার সুরজভাই গরিব মানুষদের কথা চিন্তা করে।

অথচ এই মানুষটিকে নির্মমভাবে নিজেদের পথ থেকে সরিয়ে দেয় শাসকগোষ্ঠী। অসংখ্য বুট আর হান্টারের আঘাতে সুরজভাইয়ের দেহের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। গরিব শ্রমিকদের নিজের জীবন বিপন্ন করে তাদের ন্যায়্য পাওনা পাইয়ে দিতে বদ্ধপরিকর সুরজের চরিত্র আমাদের আরও অনেক সুরজের আত্মবলিদানের উপস্থিতির আভাস দেয়। বিদেশী মালিকরা চলে গেলে এখন পর্যন্ত অনেক চা বাগানে দেশীয় মালিকদের অত্যাচারের নমুনা দেখে বিদেশীদের অত্যাচারের নির্মম ইতিহাস আমাদের চোখে ভেসে উঠে।

''আলো ফোটার আগে'' গল্পটিতে নিজের পরিবারের জন্য খেটে খাওয়া, সন্তানদের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত এক রমণীর মাতৃত্বের প্রকাশ সাবলীলভাবে ব্যত্ত(হয়েছে। ফুলবাসিয়া নামে চরিত্রটি সংসারের ঘানি টানতে টানতে নিজের অস্তিত্ব ভুলতে বসেছে। স্বামী অচল, ছেলেমেয়ে সহ সংসারের সাতজন সদস্যের মুখের অন্ন জোটাতে সে হিমশিম খাচ্ছে। সংসারের জন্য যে মানুষটির চিন্তা ভাবনা করা, দায়িত্ব পালন করা প্রয়োজন সেইসব ভার গিয়ে পড়েছে ফুলবাসিয়ার উপর। তার এই অভাব অনটনের সংসারের যেটুকু শান্তি ছিল তাও কর্পূরের মতো উবে গেছে বড় ছেলে বাবুয়ার নি(দ্দেশের পর। (ুধার জ্বালা সহ্য করতে না পেরে ছেলেটি পালিয়ে গেলে দু'মাস থেকে কোনো খবর পায়নি ফুলবাসিয়া। ছেলেহারা মা প্রতিরাতেই প্রতী(া করে আজ বুঝি তার ছেলে এসে বলবে — 'ভুখ লেগেছে মা, খেতে দে।' অনুশোচনার জ্বালায় অবিরত জ্বলতে থাকে ফুলবাসিয়া। প্রত্যেকরাতেই শুধু নি(পায় প্রতী(ার কাল গুণে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করে উঠতে পারে না সে। বাগানে পাতিতোলার ফাঁকে ফাঁকে তার মাতৃত্ব ছেলের জন্য জেগে উঠে। অন্যদের কাছে সমস্যার সমাধান চেয়েও সে হতাশ হয়। ফুলবাসিয়ার সংসারের অভাব অনটনের কথা বলে সামান্য কিছু টাকার বিনিময়ে ভোগ করতে চেয়েছিল ফুলবাসিয়ার দেহটাকে। কিন্তু ফুলবাসিয়া সংসারের অভাব অনটনের সামনে তার সতীত্বকে বিসর্জন দেয়নি।

প্রতিটি চা বাগানে প্রায় একই দৃশ্য চোখে পড়ে। সারাদিন চা পাতা তোলার কাজ, সন্ধেবেলা ঘরে ফেরা। তারপর মদ খেয়ে গালিগালাজ ও একে অন্যকে মারধোর করা। এই চেনা পরিচিত পরিস্থিতির মধ্যে হাফিয়ে উঠে লালিয়া। 'শতেক শতাব্দী

ধরে' গল্পটির লালিয়া চরিত্র অন্যান্য নারী চরিত্র থেকে স্বতন্ত্র। লালিয়ার সমবয়সী অন্যান্যরা এ পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে মানিয়ে নিয়েছে। তবে লালিয়া অন্যান্য মেয়েদের থেকে আলাদা। নয় বছর বয়সে সে বাবুদের বাড়িতে কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু পড়াশুনাও শিখেছে। তাই তার পৃথিবীটা সমবয়সী সঙ্গিনীদের মত ছোট এক চা বাগানে সীমায়িত নয়। তাই বোধ হয় বস্তির নোংরা এই পরিরেশ একদম সহ্য করতে পারে না। সবদিক থেকে তারা যে শাসকগোষ্ঠী থেকে অনেক পথ পিছিয়ে লালিয়া সেটা অনুভব করতে পারে। সে যখন দেখে রাতে বাবুসাহেবদের কোয়ার্টারে লাল নীল ইলেট্রিক বাতি জ্বলে আর তাদের ঘরে জ্বলে সামান্য কুপি বাতি। তাও আবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। তাদের এই অসহায়ত্ব, তাদের দরিদ্রতা, তাদের নির(রতা কবে দূর হবে। সাহেব বাবুদের বিলাসিতার প্রাচুর্য এসব দেখে তীব্র এক জ্বালায় অনবরত পুড়তে থাকে হৃদপিণ্ড। প্রতিশোধের দূরন্ত স্পৃহা বুকে জাগে লালিয়ার। কিন্তু সে একান্ত অসহায়। কেউ তার মানসিক পরিবর্তনকে মূল্য দেয় না, একদিন কথায় কথায় সখী ফুলমণিকে এসব কথা বলেছিল। শুনে ফুলমণি বলেছিল —

> ''ধুৎ তুই কিতাব পড়েছিস, তো তাই
> মগজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে, হামদের মতো
> মানুষদের লেখাপড়া করতে নাইরে।''[২৮]

লালিয়া ভাবে রাস্তার এপাশ আর ওপাশে কত তফাত। একদিকে আলোয় আলোময় আর অপরদিকে নিশ্চিদ্র অন্ধকার। অথচ দুদিকেই মানুষ বাস করছে। একদিকে অন্ধকারে না খেতে পাওয়া মানুষদের দল, আর অন্যদিকে অত্যধিক ভোজন তৃপ্ত স্বাস্থ্যোজ্বল মানুষ।

ইদানিংকালে বাগান অঞ্চলে উগ্রপন্থীর যে সমস্যা, উগ্রপন্থীদের অবাধ চলাচল, নিরীহ মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা দাবি, এসব ব্যাপার উঠে এসছে 'রামপিয়ারীর আধার রাত' গল্পটিতে। একদল উগ্রপন্থী বাগানের ম্যানেজার সহ রামপিয়ারির স্বামী ছগনলালকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়ে ৫ লাখ টাকা দাবি করে বাগান কর্তৃপ(র কাছে। নববিহিতা রামপিয়ারি খবর শুনে হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে স্বামীর কথা। ছগনলালকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ায় অসহায় নিরপরাধ

রামপিয়ারির জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। পাঁচলাখ টাকা যদি অবিলম্বে ওদের জানানো ঠিকানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় তবেই ওদেরকে ছাড়া হবে। অন্যথা সচরাচর যা ঘটে চলেছে তাই ঘটবে। একথা শুনে রামপিয়ারি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। রামপিয়ারি অস্থির এক দুর্ভাবনায় ছটফট করতে থাকে। গল্পটি পড়লে পাঠক সমাজ অতি সহজভাবেই সেইসব অনুপস্থিত উপস্থিত অসহায় রামপিয়ারির মতো আরো অনেক রামপিয়ারির মনলোকের ব্যথাকে উপলিব্ধি করতে পারবে।

চা শ্রমিকদের কাহিনী নিয়ে লেখা প্রত্যেকটি গল্পের মধ্যে একটি দৃশ্যই বারবার ভেসে উঠে। (ুধার জ্বালায় জ্বলছে বাগানের প্রতিটি শ্রমিকের পরিবার। দু'বেলা দু'মুঠো ডাল ভাতের জন্য তারা হাহাকার করছে। এমনই একটি গল্প 'অরণ্যের অন্ধকার' দীর্ঘদিন উপোস থেকে আর আধপেটা খেয়ে খেয়ে পেটের অসুখ বানিয়ে নিয়েছে গল্পের মূল চরিত্র লখিয়া। পেট খালি থাকলেই তার ব্যথা উঠে। কিন্তু কোন গত্যন্তর নেই। সে একাই বাগানে চা পাতা তোলার কাজ করে পরিবারের চার পাঁচজন সদস্যের অন্ন যোগায়। এমতাবস্থায় তার পেট ভরে খাবারও জুটে না। স্বামীর আচরণে রাগে দুঃখে ঘৃণায় সমস্ত অন্তঃকরণ বিদ্রোহ করতে চাইছে লখিয়ার। সে এমন এক দুনিয়ায় চলে যেতে চাইছে যেখানে অত্যাচারী স্বামী থাকবে না, দজ্জাল (কমী নেই, (কমীর গুণ্ডা ছেলে গুলো নেই। নেই ম্যানেজার সাহেবের গাড়ির ধূলো, থাকবে না পাতিবাবু, মহরিবাবুর তলবের টাকা চুরি, মাঝে মধ্যে প্রবল সুদে ধার নেওয়ার ফলে বিশালকার কাবুলিটির চোখ রাঙানো আর অশ্রাব্য গালিগালাজ। যেখানে নেই (ুধা, ক্লান্তি, অপরিমিত খাটুনির নিদা(ণ দাহ। কিন্তু কোথায় যাবে তার সন্তানদের ফেলে। বিশেষভাবে গর্ভবতী বড় মেয়ের কথা বারবার মনে হয়। সন্তানদের স্নেহে বশীভূত এক মাতৃত্ব নিজের শরীরের কথা চিন্তা না করে সংসারের ঘানি টেনে চলেছে।

বরাক উপত্যকার চা বাগানের প্রে(িত কেন্দ্র করে গত চার/পাঁচ দশক যাবৎ সাহিত্য-সংস্কৃতির যে ধারা বহমান, তাতে আর এক উজ্জ্বল নাম কাজল দেমতা। জন্মসূত্রে এবং কর্মসূত্রে চা বাগানের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যই হয়তো তিনি চা শ্রমিকদের খুব সামনে থেকে ভালভাবে ল(্য করেছেন এবং তাদের জীবনের নানা ঘটনা থেকে গল্প লেখার অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তার লিখিত গল্পের মধ্যে অন্যসুর বেজে উঠেছে। তার গল্পের চরিত্রের মধ্যে কৃত্রিমতা বিন্দুমাত্র নেই বললেই চলে।

১৩৯২ বাংলা থেকে প্রকাশিত কাজল দেমতার সাহিত্য সৃষ্টির একটি তালিকা

— শীর্ষক	পত্রিকার নাম	প্রকাশনার নাম
১। কবিতা		
আশ্রয়, গৃহস্থালী, পুজোর রৌদ্র,		
অমৃতপাখি, বাঁচা, বনানী, পাপিয়া		
দুটির খোলসা হাসি	উধারবন্দ	১৩৯৩
চা বাগানের দুপুর, জঞ্জাল,		
মৌলমণিমুক্তো, পরিবেশ দূষণ,		
সৃষ্টি	শারদীয় উধারবন্দ	১৩৯৯
সা(ীর কাঠগড়ায়	উধারবন্দ	১৪০১
জাহাজ ও জানালা	গ্রামবার্তা	১৪০২
সপনদেখা, আশ্বাস, একালের যীশু	উধারবন্দ	১৪০৩
২। গল্প —		
জীবনের অন্যনাম —	উধারবন্দ	১৩৯২
দ্বন্দ্ব —	উধারবন্দ	১৩৯৫
পার্বতীর সোমসার —	শপথ	১৪০১

ফুলমণি —	উধারবন্দ শারদ সংখ্যা	১৪০৪
তীরন্দাজ —	উধারবন্দ, পূজা সংখ্যা	১৪০১
একটি সাহস মৃত্যু —	উধারবন্দ ,পূজা সংখ্যা	১৪১২

৩। প্রবন্ধ

শিল্প নয়, শিল্পী নয় —	স্রোতস্বিনী	১৩৯৬
চা বাগান থেকে বলছি —	মাটি	১৩৯২।

তাছাড়া মহাশ্বেতা দেবীর 'শালগিরা' উপন্যাস অবলম্বনে মাতৃভাষায় নাটক লিখেছেন। 'তিলক মাঝি' এবং তাতেই (্যান্ত না হয়ে নাটকটি নিজের নির্দেশনায় মঞ্চস্থ করেন বড়শিঙ্গার গির্জা ঘরে ১৮৮৯ এর জানুয়ারিতে। [২৯]

শ্রীমতী দেমতার জন্ম উধারবন্দ থানার অধীন বড়শিঙ্গা চা বাগানে। স্থানীয় পাঠশালায় তাঁর হাতে খড়ি। শৈশবেই শ্রীমতী দেমতা তাঁর মেধার স্বা(র রাখেন। উধারবন্দ সংলগ্ন গ্রাম বাগিচায় কাজল ছাত্রাবস্থাতেই নানা ত্রি(য়াকাণ্ডে জড়িয়ে ছিলেন। পরে উধারবন্দ দুর্গানগর নয়ারাম হাইস্কুলে পাঠরত অবস্থায় তিনি শি(ককূলের নজর কাড়েন। মাধ্যমিক পাশ করে কাজল দেমতা শিলচরের কাছাড় কলেজে উচ্চতর শি(ালাভে প্রয়াসী হন। তারপর পড়াশুনার পালা শেষ করে বড়শিঙ্গা চা বাগানের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শি(কতার বৃত্তি গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর শিল্প-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ অনুরাগ সবার নজরে পড়ে। কিন্তু পারিপার্শ্বিকতার চাপেই হোক বা অন্য যে কোনও কারণে তাঁর প্রতিভার আশানুরূপ স্ফূরণ হয়নি। অথবা এমনটাও হতে পারেন, তিনি নিজেই নিভৃতির অন্তরালে থাকা শ্রেয় মনে করেন। অবশ্য আশৈশব যারা তাঁকে ল(্য করেছেন তাদের দু'একজন অন্তত শ্রীমতি দেমতার আপাত নীরবতাকে মেনে নিতে পারেননি। তাদের উদ্যোগে স্বভাব লাজুক, বা বলা ভাল বাগান সংস্কৃতির archetype কাজল তাঁর শিল্পী সত্তার প্রকাশে এগিয়ে এলেন। আর সেই সূত্রেই বছর পঁচিশ আগে তাঁর লেখা, বিশেষত গল্প-কবিতার সঙ্গে আমাদের

পরিচয়। স্থানীয় পত্র-পত্রিকা ও স্মারকগ্রন্থে প্রায়শই তাঁর সৃষ্টিধর্মী রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সংর(ণের অভাবে এবং অবহেলায় তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির অনেকখানিই আজ বিলুপ্তির অন্তরালে।[৩০]

কাজল দেমতার পারিবারিক ঐতিহ্য অনেকটা সমৃদ্ধ। কাজলদির। (এখন আমি কাজলদি বলেই ডাকি)। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি বলেন, যে বরাকের চা বাগানে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে জনজাতি বা উপজাতির লোকেরা যেভাবে এসেছিলেন, তাদের পূর্বপু(ষরাও একইভাবে বরাক উপত্যকায় আসেন। বরাক উপত্যকার বিভিন্ন ছোটবড় বাগানের পর শেষপর্যন্ত বড়শিঙ্গা বাগানে তার পূর্বপু(ষরা পাকাপাকি বসবাস শু(করেন। কাজলদির বাবা সিমসন দেমতা কর্মজীবন শু(করেন অ(ণাবন্দ চা বাগানের ফিটার হিসেবে। আজ যে জায়গায় তাঁদের বসতবাড়ি তা বড়সিঙ্গা চা বাগান সংলগ্ন হলেও বাগান এলাকাজুড়ে নয়। [৩১]

শৈশবে বাবার কাজের ফাঁকে গল্প বলার শৈলী কাজলদিকে আকৃষ্ট করেছিল। বাবা তার কথকশৈলী শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাননি। সুযোগ পেলেই তিনি বাড়ির ছেলেমেয়েদেরকেও কোনও ঘটনা বা ব্যক্তি(গত অভিজ্ঞতা বর্ণনায় উৎসাহ দিতেন। এভাবে বাড়ির চার দেওয়ালের মধ্যেই সংস্কৃতি চর্চার একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি কাকার অভিনয়ের সহজাত প্রতিভা তাকে প্রত্য(ভাবে একজন সংস্কৃতি কর্মীর আদর্শে প্রাণিত করেছিল। [৩২]

কাজলদির সঙ্গে আলাপ করে একটা জিনিস স্পষ্ট যে, বাগানের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ মর্মে ১৯৭০ সালে 'মাণ্ডি সাংস্কৃতিক সংস্থা'র আত্মপ্রকাশ। সংস্থার সদস্য হিসেবে বাগানের ছেলেমেয়েদের নিয়ে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। শুধু বড়শিঙ্গা বাগানই নয়, তৎসংলগ্ন অনেক বাগানের বিভিন্ন চা জনজাতিদের সংস্কৃতিকে টিকিয়ে রাখার কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রাখেন। কাজলদি এখন চাকরি জীবন থেকে অবসর নিয়েছেন। অবসরজীবনের প্রতিটি মুহূর্তই যেন তাদের নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। বরাক উপত্যকার আনাচে-কানাচে, গ্রাম-গঞ্জ চা বাগানে, গান্ধিমেলা মুক্ত(মঞ্চ, আকাশবাণী ও দূরদর্শন কেন্দ্র বিভিন্ন মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন চা সংস্কৃতির ডালা সাজিয়ে।[৩৩]

কাজল দেমতার লেখা একটি গল্প হল 'ফুলমণি'। ফুলমণি গল্পে একটি মেয়ের জীবনের নানা টানাপোড়েনকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। শৈশবেই ফুলমণির মা মারা গেলে বাবা আর তার দুই দাদার আদরযত্নে বড় হয়ে উঠে। মানুষ বোধ হয় এমনি থাকে, হাজারো দরিদ্রতার কুয়োয় ডুবে থাকলেও স্বপ্ন বোধ হয় মানুষের চোখ ছেড়ে যায় না কখনো। ফুলমণিও স্বপ্ন দেখে ভালভাবে বেঁচে থাকার। কিন্তু তার স্বপ্ন কোনদিন সত্যি হয় না। সমাজের নিষ্ঠুরতার বশবর্তী হয়ে ছোটবেলা থেকেই একমাত্র পেট ভরে খাবার আশায় অপরের বাড়িতে ছাগল আর গ(চড়ানির কাজ করে। একটু বড় হলে সংসার চালানোর জন্য সামান্য কয়টা টাকা উপার্জনের তাগিদে শহরে যায়, মানুষের বাড়িতে কাজ করার উদ্দেশ্যে। শহরে গিয়ে ভালভাবে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকারও তার নেই। বাড়ির মালিকের লালসার শিকার হতে হয় তাকে। অসুস্থ বাপকে দেখতেও যেতে পারে না। একদিন বাপ এসে নিয়ে গিয়ে ফুলমণিকে বিয়ে দেয়। বিয়ের পর স্বামী মারা গেলে চার পাঁচটা ছেলেমেয়ের দায়িত্ব সে একাই বহন করে। ফুলমণির মতো আরো অনেক ফুলমণিরা আছে, যারা জন্মই নেয় শুধু কষ্ট পেতে। শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবন, তারপর কবে যে বৃদ্ধ হয়ে যায় তাদের মনেই থাকে না। ফুলমণির মতো আরও অনেক ফুলমণিদের হারিয়ে যাওয়া শৈশবের চেহারা আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে।

আরেকটি গল্প হল 'জীবনের অন্য নাম' জন্মের পরেই মা-মরা এক মেয়ের সমাজে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে বড় হয়ে উঠাকে উপজীব্য বিষয় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। জংলীর মা তাকে জন্ম দিয়েই মারা যায়। তার বাবা মদ ও তাড়ির মধ্যে নিজেকে নিমজ্জিত করে দিয়েছে। ফলে খুব ছোটবেলা থেকেই জংলীর মা-বাবার স্নেহ-ভালবাসা ছাড়া অনাদর অবহেলা আর অনাহারে-অর্ধাহারে তিল তিল করে বেড়ে উঠে। জংলী কোনদিন আধপেটা আবার কোনদিন না খেয়েই কেমন করে বড় হয়ে যায়। তারপর একদিন ছাগল চড়ানির কাজ পেয়ে যায় অপে(াকৃত স্বচ্ছল কৃষক পরিবারে। তারপর একদিন শহর থেকে দুজন লোক এসে শহরে, কাম দেবে বলে জংলীকে নিয়ে যায়। যতই জংলী বড় হতে থাকে সমাজের কিছু মানুষের লালসার চোখ তাকে ঘুর ঘুর করে দেখতে থাকে। অবশেষে সমাজের মানুষের সামনে জংলীকে হার মানতে হয়। বাড়ির মনিবই একদিন তাকে লালসার শিকার বানায়। নানা ঘাত-

প্রতিঘাতের মধ্যেও সে সামান্য লেখাপড়া শিখে একটা স্কুলে আবার কাজ যোগাড় করে নেয়। অবশেষে একদিন জংলীর বাবা এসে তাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ের নামে প্রায় বিত্রি(করে দেয়। স্বামীর মুখে বিত্রি(র কথা শুনে জংলী ভাবে শাক-সবজি-চাল-ডাল এর মত মানুষও বিত্রি(হয় সে জানত না। জগন মাঝি বিত্রি(হয়েছে, ওর জমি গেছে, গাঁ ও ঘর গেছে, জংলীর স্বপ্ন সাধ শরীর ও শেষে মনটাও বিত্রি(হয়ে যায়। বন্দুকহীন সেনার সঙ্গে সমাজের ঘুপচিতে আনাচে কানাচে বসে থাকা শেয়ালের সঙ্গে বুঝে ওঠা কত দুষ্কর তা যে বুঝতে পারেনি। সমাজের শাসকগোষ্ঠীর নানা চাপে একটি নারীর জীবনে নেমে আসে নানা বিপর্যয়।

'দ্বন্দ্ব' গল্পটিতে জাতপাতের একটা দ্বন্দ্ব যেন সমস্ত সমাজকে অক্টোপাসের মতো আঁকড়ে ধরেছে। এখানে ছোটজাত আর বড় জাতের যে দ্বন্দ্ব তার যে ক(ণ পরিণতি তাই উপস্থিত হয় পাঠকের সামনে। বড়জাতের বনবালা ভালবাসে ছোটজাতের পাহাড়িকে। একথা বনবালার বাবা গর্জন সিং শুনতে পেয়ে হুংকার দিয়ে বলে —

> ''ছোগড়াটার কাম নাই, ধান্না বা বুদ্ধি কত? আকাশের চান ধরবেক। জাতটা যে তোর ভিন, সে খেয়ালটাই ভু লায়ে বসে আছিস। বিটির বিহা দিব হামি হামার মতন যার কাম ধান্না আছে। জমিন উ মিন বানাইছে।''[৩৪]

পাহাড়ির ধরাবাধা কাজে মন চায় না, সে স্বাধীনভাবে একটু কিছু করতে চায়। পৃথিবীর চেহারাটাকে খানিক দেখেছে পাহাড়ি। কত মানুষ কত রকমের ধান্দা না দেখলে বি(্বাসই হয় না। (জি রোজগারের নামে শহরে গিয়ে সে দুনিয়াটাকে দেখতে চায়। গল্পটির শেষে দেখা যায় পাহাড়ি একদিন রাতে মদ খেয়ে গর্জন সিং এর বাড়ির সামনে গিয়ে গালিগালাজ শু(করে। গর্জন সিং বেড়িয়ে এসে তাকে মানুষের সাহায্যে মেরে রক্ত(াক্ত(অবস্থায় ফেলে রাখে। ভালবাসার পাত্রী বনবালার জন্য বাজার থেকে আনা কাঁচের চুড়িগুলোও তার মনের মত ভেঙ্গে খান খান হয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

বর্তমানে বাগানে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় অর্থাৎ বাগানের খরচ কমাতে শ্রমিক ছাটাই এর ফলে অনেক শ্রমিককে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যেতে হয়। এমনই সনাতন নামের এক শ্রমিকের বাগানে কাজ না পেয়ে অন্যত্র কাজের জন্য যাওয়া, তার সুফল কুফল বর্ণিত হয়েছে 'অপে(া' গল্পটিতে। এই গল্পটিতে মোহনপুরা বাগানের এক শ্রমিকের কাহিনীকে তুলে ধরা হয়েছে। বাগানের কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় অনেক লোকের সঙ্গে সনাতনও যায় মধুরায় পাথর তুলতে। জলের নীচে থেকে ছোট ছোট টুকরি দিয়ে পাথর তুলে ট্রাক বোঝাই করে সে সারাদিনে পায় একশ টাকা। ছেলে আর বউকে নিয়ে বেশ কাটছিল তাদের সংসার। কিন্তু বাঁধ সাধে তার মারাত্মক রোগ। একসঙ্গে টিবি আর জণ্ডিস রোগ দেখা দেওয়ায় তার সংসারে চরম অশান্তি নেমে আসে। বাগান অঞ্চলে নানারকম রোগের প্রার্দুভাব দেখা দেয় এবং এর থেকে বিনা চিকিৎসায় অনেকে প্রাণ হারাতে হয়। এখানেই গল্পটির সার্থকতা।

গল্পকার যেহেতু বাগানের আবহাওয়াতেই বড় হয়েছেন বলে চা শ্রমিকদের বিভিন্ন দিককে ভালভাবে উপলব্ধি করেই তার গল্পের মধ্যে তাকে প্রতিফলিত করেছেন। নানা সমস্যায় জর্জরিত চা শ্রমিকদের জীবন। পড়াশুনাটা তাদের মধ্যে তেমন আবশ্যক নয় বলে কেউ তেমন বেশি পড়াশুনা করে না। কিন্তু মাঝে মধ্যে ব্যতিত্র(মও দেখা যায়। এমনই একটি গল্প 'অবলম্বন'। বিনতা নামে বাগান শ্রমিকের এক মেয়ে পড়াশুনায় খুব ভাল ছিল এবং সে হাইস্কুল পর্যন্ত যায়। কিন্তু নানা ঘাত-প্রতিঘাতে তার আর পড়া হয়নি। পড়া বন্ধ করে কিছুদিন পরেই তার বিয়ে দিয়ে দেয় মা-বাবা। এর মূল কারণ হল আদিবাসী ঘরে বয়স্ক মেয়ে রাখলে সমাজ ঘৃণা করবে। বিয়ের পর তার ছোটবেলার সঙ্গী মউয়ার সঙ্গে এক অন্য পরিবিশে, ভিন্ন চেহারায় দেখা হয়। মউয়াকে নাকি শিববাবা ভর করেছে। সে বাগানের নানা অসুস্থরোগীকে সুস্থ করে তুলেছে। মউয়ার কথা শুনে বিনতা ছুটে আসে তার ছোটবেলার সঙ্গীর সঙ্গে দেখা করতে। এসে দেখে ভিন্ন চেহারা। গল্পটিতে চা শ্রমিকদের মধ্যে নানা সংস্কার-কুসংস্কার লুকিয়ে রয়েছে তারই একটা উপস্থিতির আভাস পাওয়া যায়।

''আসমানে বাড়িয়ে হাত'' গল্পটিতে ওষুধের বদলে ঝাড়ফুকেই যে তারা বি(াস করত তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। মারাত্মক কোনও ব্যাধি হলেও তারা ওষুধের বদলে ঝাড়ফুককেই প্রাধান্য দিত। বিশখার জ্বর হলে তার স্বামী তাকে ডাক্ত(ার না দেখিয়ে

ঝাড় দিলে ভাল হবে বলে বি(্বাস করে। কিন্তু আস্তে আস্তে বিশখার স্বামী ঝম(র ভুল ভাঙতে থাকে। শেষ পর্যন্ত বিশখাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। দেরীতে হলেও ঝম(র মধ্যে যে একটা পরিবর্তন, দীর্ঘদিনের চিরপরিচিত কুসংস্কারের বশবর্তী না হয়ে তার থেকে মুক্তি(পেতে আগ্রহী, তারই বর্ণনা গল্পটিতে অন্যমাত্রা দান করেছে। কাজল দেমতার লেখা আরেকটি গল্প হল 'জীবন যুদ্ধ' গল্পটিতে মা-বাপ মরা একটি শিশুর দিদিমার কাছে বড় হওয়া এবং তার জীবনসংগ্রামের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বুধিয়া গ(চরাতে চরাতে ঠেকিশাক খোঁজে, কখনো খোঁজে জঙ্গলের মেটে আলু। বুধিয়া সারাদিন গ(চরায়। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু পড়াশুনা শেখার অদম্য ইচ্ছা ওর মনের মধ্যে। গ্রামের স্কুলের সামনে আসলেই মাস্টারমশাইয়ের পড়ানোর আওয়াজ শুনে থমকে দাঁড়ায়।

> ''সকালবেলা যখন সে চা বাগানের বাবুর কোয়ার্টার থেকে গ(নিয়ে আসে তখন দেখে পাঠশালার মাস্টার মশাই ছাত্রদের গল্প বুঝাচ্ছেন, কখনো কখনো সুর করে নামতা পড়াচ্ছে। সে নিজের অজান্তে দাঁড়িয়ে যায়, ঐখানে এলে পরে একান্ত নির্জন সময়ে সে খেয়াল করার চেষ্টা করে, কি যেন বলছিল মাস্টারবাবুটা।[৩৫]

মাস্টার মশাই ও ল(্য করলেন ছেলেটার মন অন্যরকম, অন্য ভাবনার। তিনি বুধিয়ার হাতে দুটি বই দিয়ে ওকে পড়ানোর জন্য ওনার বাড়িতে আসতে বললেন। বিকেলবেলা বুধিয়া গ(চড়ানো শেষ করে মনের ইচ্ছো পূরণের আশায় মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যেতে প্রস্তুত হয়।

আমার গবেষণা সন্দর্ভটির এই অধ্যায়ের মূল ল(্য হল গল্পগুলি থেকে চা জনজাতিদের অকথিত কাহিনীকে খুঁজে বের করা। অর্থাৎ গল্পে অনুপস্থিত উপস্থিতির জায়গাটুকুকে অন্বেষণ করা। আমি আমার সাধ্যমত বিভিন্ন গল্পকারের গল্পগুলি বি(্-ষণ করে অনুপস্থিত উপস্থিতির জায়গাটুকু চিহ্নি(ত করার চেষ্টা করেছি।

দুই পর্যায়ে বিভক্ত((প্রাথমিক এবং পরিণত পর্যায়) গল্পকার ঝুমুর পাণ্ডের নির্বাচিত সংকলনের এই বিশেষ জীবনধারা যে চিত্র ফুটে উঠেছে তাতে এই উপত্যকার জনবিন্যাসগত ও ভৌগোলিক বৈচিত্রের মাত্রা যেমন পরিস্ফূট ঠিক তেমনি চা জানজাতির জীবনের পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্ব সংকুলতার টানাপোড়েনে ফুটে উঠা জীবনের ছবিতে আমাদের অন্বিষ্ট অনুপস্থিত উপস্থিতির নূতন নূতন মাত্রা প্রতিফলিত হয়েছে।

সমস্যা ও যন্ত্রণার সূচীমুখ চিত্রণে ঝুমুরের দ্বিতীয় পর্বের গল্প আরও বেশি মর্মভেদী. সংকলিত গল্পের নিবিড় পাঠে তারই আভাস দেওয়ার প্রয়াস করা হয়েছে। অন্যান্য গল্পকারদের গল্পেও চা জনজাতিদের নানাদিকের যে বিশদ বর্ণনা রয়েছে তাতেও অনুপস্থিত উপস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। দীপ্তি দেবের গল্পে চা শ্রমিকদের জীবন সঞ্জাত নানা ঘাত প্রতিঘাতের চিত্র ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে কাজল দেমতার গল্পে চা শ্রমিকদের জীবনের চিত্রগুলি অন্য মাত্রা লাভ করেছে। তাতে যেন চরিত্রগুলি একদম অতি কাছের মানুষ হয়ে জীবন্ত হয়ে পাঠক সমাজের দ্যোতনাকে নাড়া দেয়।

তথ্য সূত্র —

১। রমা পুরকায়স্থ। বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চা। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা-৭০০০০৯। পৃঃ ২১।

২। তদেব। পৃঃ ১৪।

৩। ড০ রমাকান্ত দাস। বরাক উপত্যকার স্থান নাম। অ(র পাবলিকেশন।

৪। রমা পুরকায়স্থ। বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চা। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা-৭০০০০৯। পৃঃ ১৪।

৫। ড০ রমাকান্ত দাস। বরাক উপত্যকার স্থান নাম। অ(র পাবলিকেশন।

ভূমিকা।

৬। রমা পুরকায়স্থ। বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চা। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ। কলকাতা-৭০০০০৯। পৃঃ ১১৮।

৭। পরম্পরা । একটি ভিন্ন স্বাদের গদ্য পত্রিকা। পরম্পরা প্রকাশনী। শিলচর। পৃঃ ১৫২।

৮। তদেব । পৃঃ ১৫২।

৯। তদেব । পৃঃ ১৫৩।

১০। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিসর। রমাপ্রসাদ বিশ্বাস। পৃঃ ৬০।

১১। কথোপকথন । ঝুমুর পাণ্ডে।

১২। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিসর। রমাপ্রসাদ বিশ্বাস। প্রকাশনা সৃজন গ্রাফিকস্ অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস। প্রকাশ — শ্রাবণ ১৪১৩। পৃঃ ৮৭।

১৩। ঝুমুর পাণ্ডে। গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া, গল্প — 'বিনতি বুড়ি, গাছ গাছালি শনখাড়ি পাহাড় এবং....' পৃঃ ২০।

১৪। ঝুমুর পাণ্ডে। গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া, গল্প — 'অধিকার' পৃঃ ৩৭।

১৫। ঝুমুর পাণ্ডে। 'গেরাম থানের মানুষটা ও দুলিয়া', গল্প — '(রণ' পৃঃ ২৪।

১৬। তদেব । ‘ ডাইনি’ পৃঃ ৩২।

১৭। তদেব । ‘ ডাইনি’ পৃঃ ৩২।

১৮। তদেব । ‘ছিনতাই’ পৃঃ ৪৯।

১৯। তদেব । ‘ বিবর্ণ দ্বিপ্রহর’ পৃঃ ৫৬।

২০। তদেব । ‘লগন মাঝি’ পৃঃ ৭২।

২১। তদেব । ‘বন্যার চাঁদ’ পৃঃ ৮৭।

২২। তদেব । ‘বন্যার চাঁদ’ পৃঃ ৮৮।

২৩। তদেব । ‘দেয়াল’ পৃঃ ৮০।

২৪। বরাক উপত্যকার চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিসর। রমাপ্রসাদ বিশ্বাস। প্রকাশনা সৃজন গ্রাফিকস্ অ্যান্ড পাবলিশিং হাউস। প্রকাশ — শ্রাবণ ১৪১৩। পৃঃ ৯১।

২৫। ঝুমুর পাণ্ডে, স্বপ্ন গন্ধার খোঁজে, ‘সরস্বতীয়ার সুখ দুঃখ, পৃঃ ৮০।

২৬। দীপ্তি দেব। পয়মন্ত, ‘ চা বাগানের বিরজুলাল’, পৃঃ ২২।

২৭। দীপ্তি দেব, পয়মন্ত, ‘একটি কুড়ি দুটি পাতার দেশ’ পৃঃ ৬১

২৮। দীপ্তি দেবের একটি অপ্রকাশিত গল্প।

২৯। রমাপ্রসাদ বিশ্বাস। বরাক উপত্যকায় চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিসর। শিলচর-১, প্রকাশ — শ্রাবণ ১৪১৩, পৃঃ ৯৮।

৩০। তদেব , পৃঃ ৯৩।

৩১। কাজল দেমতার সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তথ্য জানা, তারিখ - ৩০/৩/২০১৪ইং।

৩২। রমাপ্রসাদ বিশ্বাস, বরাক উপত্যকায় চা শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক পরিসর, শিলচর - ১, প্রকাশ শ্রাবণ ১৪১৩, পৃঃ ৯৬।

৩৩। কথোপকথন, কাজলদি, ৩০/৩/২০১৪ইং।

৩৪। ম্যাগাজিন উধারবন্দ, কাজল দেমতা, গল্প দ্বন্দ্ব , পৃঃ ৪।

৩৫। 'সৃজনী', নবমবর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, ২০১২, কাজল দেমতা, গল্প — জীবন যুদ্ধ, পৃঃ ১৭।

.....